পৃথিবী দেখেছি
ইউরি গাগারিন

সমস্ত রুশ ব্যোমনাবিকদের যাত্রাক্ষণে হাজির থেকেছে সে, তাদের মতোই উদ্বেগ সহ্য করেছে।

বলেছি 'যশের জ্বর'। জনগণের মহাসাধনা ও বিজ্ঞানীদের কীর্তিতে ইউরি নিজে যে ভূমিকাটা নেয়, তার তাৎপর্য সে বুঝেছিল গভীরভাবেই। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা লোক ছিল সে, প্রশ্রয় দেয় নি আত্মগর্বের, নিজেকে কোনো একটা 'নক্ষত্রে' পরিণত করতে সে কাউকে দেয় নি। 'মানুষ' হয়েই সে থাকে।

যশটাকে সে লাগায় সাধারণ ব্রতের হিতে। দিন দিন যেন সে বেড়ে উঠতে থাকে। বেশ সেটা দেখা যেত তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং আমাদের ব্যোমনাবিকদের ব্যাপার, উভয় ক্ষেত্রেই। সবার মতো সেও তৈরি হচ্ছিল আবার ওড়ার জন্যে। বিমান চালাত সে, প্যারাশ্যুটে ঝাঁপ দিত, নিয়মিতভাবে যত রকমের সব পরীক্ষা চালাত নিজের ওপর। নানা দিক দিয়েই বাকিরা তার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছে।

তার দক্ষতা আমরা সবাই দেখেছি। দেখেছি কত চট করে ও অনায়াসে সে বৈজ্ঞানিক সমস্যা ও মহাজাগতিক টেকনলজির রহস্য ধরতে পারত। সাগ্রহেই সে নিজের জ্ঞান ভাগ করে নিত অপরের সঙ্গে।

তবে আমাদের চেয়ে অনেক আগেই এটা লক্ষ করেছিলেন, ইউরির মধ্যে বিজ্ঞানীর আদল দেখতে পেয়েছিলেন আকাদেমিশিয়ান সেগেই পাভলোভিচ করোলেভ। ইউরির মধ্যে সহজাত পৌরুষ, বিশ্লেষণী মেধা ও অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠার মিলন তাঁর চোখে পড়ে। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় ভালোরকম শিক্ষা যদি ও পায় তাহলে আমাদের বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীদের মধ্যে তার নামটাও শোনা যাবে।'

ভালোরকম শিক্ষা ইউরি পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালের গোড়ায় সে জুকোভস্কি সামরিক-বৈমানিক ইঞ্জিনিয়ারিঙ আকাদেমি শেষ করে। ইউরির ডিপ্লোমা থিসিসে গভীর বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হন আচার্য অধ্যাপকেরা।

বন্ধু হিশেবে গাগারিন ছিল চমৎকার লোক। কাজের ব্যাপারে এবং নিছক মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনায়াসে নির্ভর করা যেত তার ওপর। সর্বত্রই মানিয়ে নিত সে, যেমন নিজের বন্ধুবান্ধব, পরিচিতদের সঙ্গে, তেমনি যুব সমাজের মধ্যে — সম্মেলন, কংগ্রেস, বৈঠকে অনেক সময় সে এদের সঙ্গে কাটিয়েছে।

অবকাশের সময় ইউরি ভালোবাসত শিকারে যেতে, মাছ ধরতে, সপরিবারে ছুটি কাটাতে, মেয়েদের নিয়ে শহরের বাইরে ঘুরে বেড়াতে। মেয়েদের নিয়ে তার গর্ব ছিল। এই জন্যে গর্ব যে বাপের খ্যাতি নিয়ে বড়াই করার লোভ ছিল না তাদের। এই জন্যেও গর্ব যে পড়াশুনায়, সঙ্গীতে ভালো ছিল তারা, মন ছিল উদার।

রবিবারের দিন প্রায়ই স্ত্রীকন্যা নিয়ে সে যেত গ্জাৎস্কে তার নিজের বাড়িতে মা-বাপের সঙ্গে দেখা করতে।

১৯৬১ সালের একটা এপ্রিলের সন্ধ্যা আমার মনে পড়ছে—সদ্য সে তখন মহাকাশ থেকে ফিরেছে।

দু'জনে আমরা ভলগা তীরে পায়চারি করছি। কী নিয়ে আমাদের আলাপ হত তখন? মানুষের কাছে মহাকাশের দরজা খুলেছে, আর আমাদের স্বপ্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু আমাদের সে স্বপ্ন তখন যত স্পর্ধিতই হোক, কল্পনাও করতে পারি নি কত দ্রুত বেড়ে উঠবে ব্যোমনৌবিদ্যা। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল যে মহাকাশ গবেষণা ও পাইলট চালিত উড্ডয়নের যুগ শুরু হল, সেটার এমন খরবেগ বিকাশ ঘটবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যোমনাবিক কনস্তান্তিন ফেওক্তিস্তভ আমাদের মহাজাগতিক যুগটা সম্পর্কে একটা চমৎকার উক্তি করেছিলেন:

'মহাকাশে ইউরি গাগারিনের উড্ডয়ন? এটা একটা মহাকীর্তি, মানুষের মহাজয়। কিন্তু লোকে বললে—মন উঠছে না।

'গ্রুপ উড্ডয়ন? মন উঠছে না।

'নানা ধরনের লোক নিয়ে মহাজাগতিক পোত? মন উঠছে না।

'উন্মুক্ত মহাকাশে মানুষ? মন উঠছে না।

'চাঁদে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কোমল অবতরণ? মন উঠছে না।'

আর কনস্তান্তিন ফেওক্তিস্তভের কথাটার পরিপূরণ করে বলা যাক: চাঁদে মানুষ নামল। এ বিজয়ে উল্লাস করলে লোকে, আনন্দ করলে, আর তারপরেও বললে: মন উঠছে না।

পৃথিবীর নিকট মহাকাশে গড়া হল পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র, পৃথিবী বহির্ভূত ভবিষ্যৎ জনপদের যা অগ্রদূত, বিজ্ঞানীরা যেখান থেকে প্রকৃতির রহস্যে অভিযান চালিয়ে মহান রুশ বৈজ্ঞানিক কনস্তান্তিন ৎসিওলকোভস্কির কথা মতো 'জয় করবে সমস্ত সৌরমণ্ডলীর মহাকাশ'। কিন্তু লোকে বললে: মন উঠছে না।

লোকের স্বভাবই এই। অর্জিততেই থেমে যেতে সে পারে না, পারা উচিত নয়। চারিপাশের গোটা জগত, সমস্ত মহাকাশকে অধীনস্থ না করে কখনো শান্ত হবে না সে।

এই স্বপ্নেই দিন কাটিয়েছে ইউরি গাগারিন, মহাকাশের প্রথম নাগরিক এই স্বপ্নের হাতছানিতেই সাধন করেছে তার মহাকীর্তি আর কাজ চালিয়ে যেতে যেতেই এই স্বপ্নের বেদীতেই জীবন দিয়ে গেছে সে।

গেরমান তিতোভ
পাইলট-ব্যোমনাবিক
সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর

সোভিয়েত ইউনিয়নের
পাইলট-ব্যোমনাবিক
সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর

ইউরি গাগারিন

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

অঙ্গসজ্জা: ভ. বেলান

Ю. ГАГАРИН

«ВИЖУ ЗЕМЛЮ»

На языке бенгали

'কী করে ব্যোমনাবিক হয়ে উঠলেন, বলুন না...'

প্রথম একথাটা আমায় শুনতে হয় মহাকাশ থেকে ফেরার দিন কতক পরে, যে চিঠিগুলো পেয়েছিলাম তার মধ্যে।

বলাই বাহুল্য আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ তরুণদের, বাচ্চাদের। প্রায়ই দেখা হয় তাদের সঙ্গে। আর সর্বদাই প্রথম দিককার প্রশ্নই হয়:

'কী করে ব্যোমনাবিক হয়ে উঠলেন?'

জবাব দিই, ওড়ার কথা বলি, কিন্তু কারো কারো চোখে অবিশ্বাস উ'কি দেয়।

'প্রধান রহস্যটা উনি নিশ্চয় চেপে গেলেন...' ভাবে কেউ কেউ।

কেউ বা বলে, 'একেবারে নিতান্ত সাধারণ একটা ছেলে ব্যোমনাবিক হয়ে গেল, তা হতে পারে না!'

'ইউরি আলেক্সেয়েভিচ, আপনার জীবন নিশ্চয় অন্য সকলের মতো নয়,' নিঃসংশয়ে একবার মন্তব্য করেছিল একটি স্কুলের মেয়ে।

তাই আমার মহাকাশ যাত্রার পথে যে কোনো গোপন রহস্য নেই তার প্রমাণ হিশেবে আমার জীবনকথাটা পেশ করা যাক।

আপাতত সবই পার্থিব

ছেলেবেলা আমার কাটে স্মোলেন্স্ক অঞ্চলের ক্লুশিনো গ্রামে, পরে গ্জাৎস্ক নামে একটা ছোট্ট শহরে। দাদুদিদিমাদের মতো মা-বাপও ছিলেন চাষী। বিদেশে একবার খবর রটেছিল যে আমি নাকি অভিজাত প্রিন্স গাগারিন বংশের লোক। বিপ্লবের আগে এর মস্ত প্রাসাদ এবং অনেক ভূমিদাস ছিল। কথাটা শুনে আমি প্রাণ খুলে হেসেছিলাম।

আমার মা-বাপের এখন বেশ বয়স হয়েছে। জন্ম তাঁদের সোভিয়েত রাজ প্রতিষ্ঠার আগে। তাই শিক্ষাদীক্ষা বিশেষ হয় নি। ১৯১৭ সালের আগে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তো আর সব চাষীর ছেলের জুটত না। তবে মনে আছে, গাঁয়ের লোকে বলত, 'আলেক্সেই গাগারিনের হাত দুখানা সোনার হাত!'

সত্যিই, ছুতোর, রাজমিস্ত্রি, হেলে চাষী, ফিটার—সব কাজেই ওস্তাদ ছিলেন বাবা। আমাদের তিনটি ভাই ও একটি বোনকেও তিনি তা শিখিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় নিজে নিজেই আমাদের হাতে কুড়ুলে হাতল বসানো, ঘোড়া জোতা, বা বেড়া মেরামতের মতো কোনো একটা কাজ প্রথম উৎরোলে ভারি গর্ব হত।

অনেক বই পড়েছিলেন মা। আমার প্রায় যে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারতেন তিনি। আমার মনে হত, এখনো মনে হয় যে তিনি সাংসারিক জ্ঞানের এক অফুরান ভাণ্ডার।

পড়াশুনোয় আমার মন ছিল। প্রগ্রেস কার্ডে বেশি নম্বর তোলার দিকে ঝোঁক ছিল না, চেষ্টা করতাম যত পারি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব জেনে নিই।

তবে প্রগ্রেস কার্ড কথাটা একটু ভুল হল। ১৯৪১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ক্লুশিনো গ্রামের যে স্কুলটার চৌকাট আমি প্রথম মাড়াই, সেখানে প্রগ্রেস কার্ডের কোনো বালাই ছিল না। যুদ্ধ চলছিল তখন। ছোট্ট একটা কামরায় একই সঙ্গে বসত দুটি ক্লাস—প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণী। তারপর পরের শিফটে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী। খাতাপত্তরও ছিল দুর্লভ। প্রায়ই লেখার কাজ সারতাম খবরের কাগজের ফাঁকা জায়গায়, ওয়াল-পেপারের টুকরোয়।

যুদ্ধ চলল তো চললই...

একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখলাম দুটি সোভিয়েত বিমান নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

আমাদের ছেলেদের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'আরে দ্যাখ দ্যাখ, বিমানটা ঘায়েল হয় নি তো?'

সত্যিই, ছোট্ট জঙ্গী বিমান একবার এ ডানায় একবার ও ডানায় টলে টলে পড়ছে আর কেবলি নিচে নামছে। অন্য বিমানটা তার ওপরে বড়ো বড়ো চক্করে পাক দিচ্ছে, যেন একটা আহত পাখির দেখাশোনা করছে আরেকটা পাখি। বিমানটার পতন ঠেকানোর জন্যে নিশ্চয় অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল বৈমানিককে। শেষ পর্যন্ত গাঁয়ের প্রান্তে একটা জলায় নামল বিমানটা। নামতে গিয়ে ভেঙে গেল, তবে কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়তে পেরেছিল বৈমানিক।

'অন্যটাও নামছে!'

ছুটলাম আমরা জলাটার কাছে।

সাত্যিই, প্রথমটার পাশেই দ্বিতীয় বিমানটাও নামলে একটা মাঠের ওপর। রাত তারা কাটালে ক্রুশিনো গ্রামে, সকালে দুজনেই উড়ে গেল অক্ষত বিমানটায়।

পরে ফ্রন্টে যারা লড়ে এসেছে তাদের কাছে, বিমান ক্লাবের শিক্ষকদের কাছে, আমি যে বিমান বাহিনীতে ছিলাম তার কম্যান্ডারদের কাছে অনেকবারই আমি এই প্রবাদটা শুনেছি: দিতে হয় দেবে জান, বাঁচাবে সাথীর প্রাণ। তার মানেটা কী, সেটা আমি আগেই বুঝেছিলাম। দুই বৈমানিকের ওই ঘটনাটা, তাদের পৌরুষের কথা আমি কখনো ভুলব না।

যুদ্ধে অনেক ক্ষয়ক্ষতি সইতে হয়। ১৯৪৯ সালে যখন আমার পনের বছর পূর্ণ হল, ঠিক করলাম মাধ্যমিক স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে সংসারে সাহায্য করতে হবে। আপাতত ঢুকব কারখানায়, তারপর পড়া চালাব করেসপণ্ডেন্স কোর্সে। গ্জাৎস্ক শহরের অনেক ছেলেই তাই করেছিল।

মা-বাবা অবিশ্যি আমায় ছাড়তে চাইছিলেন না। তাঁদের ধারণা ছিল আমি নাকি তখনো ছোটো, যদিও আমার মতো বয়সে নিজেরাই তাঁরা পূর্ণ বয়স্কের মতো কাজ করেছেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি মস্কো যাব আমার কাকার কাছে, কী করতে হবে না হবে তিনিই বলবেন।

মস্কোর উপকণ্ঠে লুবের্ৎসী শহরে কৃষিযন্ত্র কারখানার বৃত্তি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বললেন কাকা।

বিদ্যালয়ে আমার ভবিষ্যৎ পেশা নির্ধারিত হল ঢালাই কলঘরের ঢালাইকার। পেশাটা সহজ নয়। তাতে শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নয়, রীতিমতো দৈহিক শক্তিও দরকার। তবে ফাঁকা সময় কিছুটা পেতাম। কমসোমল সংগঠনের কাজকর্ম এবং বাস্কেটবল খেলাটা চালানো যেত তাতে। মাথায় বিশেষ লম্বা না হলেও এ খেলাটায় আমার ঝোঁক ছিল খুব।

কিন্তু শ্রমিক তরুণদের সান্ধ্য স্কুলে যখন ভর্তি হলাম, তখন বেশ অসুবিধা হত। আফসোস হত, দিন কেন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা নিয়ে। তাহলেও স্কুল শেষ করলাম। তখন বৃত্তি বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর সাহায্যে আমি ও আরো কিছু ছেলে গেলাম ভলগা তীরের সারাতভ শহরের শিল্প টেকনিকাল কলেজে পড়তে। পাঠটা এখানেও ঢালাইবিদ্যা নিয়ে, মহাকাশ তো দূরের কথা, বিমানের সঙ্গেও যার সম্পর্কটা নিকট নয়।

তাহলেও সারাতভেই আমায় সেই ব্যাধিটা পেয়ে বসল, চিকিৎসাশাস্ত্রে যার নাম নেই — আকাশের এক অধীর আকর্ষণ, ওড়ার ঝোঁক।

কীভাবে শুরু?

টেকনিকাল কলেজে ছিল নানা ধরনের চক্র আর বিভাগ। বাস্কেটবল চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমি, ভালোবাসতাম সাঁতার কাটতে। কিন্তু ভারি আকর্ষণ বোধ করতাম পদার্থবিদ্যায়। তার পেছনে ছিল আমার গ্‌জাৎস্ক স্কুলের পদার্থবিদ্যার প্রথম শিক্ষক লেভ মিখাইলোভিচ বেস্পালভের প্রভাব— ছেলেদের আগ্রহ জাগাতে পারতেন তিনি। টেকনিকাল কলেজে পদার্থবিদ্যা শেখাতেন নিকোলাই ইভানভিচ মস্ক্‌ভিন। পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাগুলো আমাদের যাদুবিদ্যার মতো টানত।

সারাতভে অবিশ্যি পদার্থবিদ্যা শিক্ষার মানটা ছিল অন্যরকম। পদার্থবিদ্যার চক্রে আমি দুটি রিপোর্ট দিই। প্রথমটি আলোর চাপ নিয়ে রুশ বিজ্ঞানী লেবেদেভের গবেষণা বিষয়ে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটির নাম ছিল 'ক.এ.ৎসিওলকোভস্কি এবং তাঁর রকেট ইঞ্জিন ও আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের মতবাদ'। রিপোর্ট তৈরি করার জন্যে ৎসিওলকোভস্কির বৈজ্ঞানিক-অতিকাল্পনিক রচনা সম্ভার এবং অনেক বই পড়তে হয়েছিল।

অন্য সব ছেলের মতো বারো বছর বয়স থেকেই আমি জ্যাক লণ্ডন, জুল ভের্ন, আলেক্সান্দর বেল্যায়েভের রচনা পড়ে আসছি। গ্‌জাৎস্কের গ্রন্থাগারে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীগুলোর জন্যে লাইন লেগে থাকত। যে যা পড়তাম, অন্যদের কাছে তার গল্প করতাম, কেউ কোনো বই আগে পড়ে ফেললে হিংসে করতাম তাকে।

ৎসিওলকোভস্কি কিন্তু ছিলেন অন্য জাতের লেখক। তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি, নিখুঁতভাবে ভবিষ্যৎ ধরার ক্ষমতা আমায় মুগ্ধ করত। তিনি লিখেছিলেন প্রপেলার চালিত বিমানের পর আসবে জেট বিমানের যুগ—সে জেট বিমান তখন সারাতভের আকাশেই উড়ছে। রকেটের কথা বলেছিলেন তিনি, সে রকেট সোভিয়েত ভূমি থেকে তখন ওপরে উঠছে, যদিও তখন মাত্র স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত।

এক কথায় ৎসিওলকোভস্কির এই ভবিষ্যদ্বাণী চোখের সামনেই ফলে যাচ্ছিল:

'মানবজাতি চিরকাল পৃথিবীতে বাঁধা থাকবে না, আলোক ও মহাকাশের অন্বেষণে সে প্রথমে বায়ুমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে সন্তর্পণে এগুবে, তারপর জয় করে নেবে সৌরমণ্ডলীর মহাকাশ।'

বলা যায়, ৎসিওলকোভস্কির রচনা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া থেকেই

আমার 'মহাজাগতিক' জীবনীর শুরু। ঢালাইকারের মধ্যে জন্ম নিল বৈমানিক। স্থির করলাম বিমান ক্লাবে যোগ দেব। স্বীকার করছি আমি আর আমার বন্ধু ভিতিয়া পরোখন্যা ও জেনিয়া স্তেশিন, আমরা তখন ভেবেছিলাম দু-এক সপ্তাহ পরেই বিমান চালানো শুরু করব। দেখা গেল, ব্যাপারটা মোটেই অমন সহজ নয়, দরকার ভালো করে তত্ত্বের ব্যাপারগুলো শেখা, ব্যবহারিক দক্ষতা রপ্ত করা অর্থাৎ খাটুনির পর খাটুনি...

আমার প্রথম প্যারাশুট ঝাঁপটার কথা বলি। হয়ত খুবই আওয়াজ হচ্ছিল বিমানটায়, হয়ত নিজেই খুব নার্ভাস ছিলাম, তাই বিমান থেকে বেরুবার জন্যে ইনস্ট্রাক্টরের নির্দেশটা শুনতে পাই নি। শুধু চোখে পড়ল তাঁর হাতের ইশারা — অর্থাৎ সময় হয়েছে।

ভেতর থেকে বেরিয়ে এলাম, উঁকি দিলাম মাটিতে। অত উঁচুতে আগে কখনো উঠি নি।

'ভীরুতা দেখাস নে ইউরি, নিচে মেয়েরা চেয়ে আছে!' আমায় উৎসাহ দিলেন ইনস্ট্রাক্টর।

কথাটা সত্যি, আমাদের বিমান ক্লাবের সহপাঠিনীরা তাদের ঝাঁপ দেবার পালার জন্যে নিচে দাঁড়িয়ে ছিল।

'লাগাও...'

মাটিতে নামলাম নিরাপদেই।

সবটাই দেখা গেল সোজা ব্যাপার, তারপর থেকে ইচ্ছে হত কেবলি ওই শাদা গম্বুজটা নিয়ে ঝাঁপ দিই।

ডিপ্লোমা পাবার পর পিছিয়ে আসা, বায়ুর রোমান্স্ ছেড়ে দেবার কথাই ওঠে না। ওরেনবুর্গের বিমান বিদ্যালয়ে দরখাস্ত দিলাম। ঢালাই টেকনিশিয়ন আমি না হলেও নিঃসংশয়ে একথা বলতে পারি যে ও বিদ্যেটা শেখার সময় যে জ্ঞান আমি অর্জন করি এবং পেশাগত যে কর্মগুণ আমার রপ্ত হয়, সেটা জীবনে খুব কাজ দিয়েছে। প্রধান কথা, প্রতিষ্ঠানের সকলের মধ্যে কাজ করতে পারা ও সমভাবী বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার অভ্যেস আমার তাতে গড়ে ওঠে।

শুধু একবার আমি প্রায় স্বপ্নভ্রষ্ট হতে বসেছিলাম, নির্বাচিত পথটা প্রায় ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। ধন্যবাদ আমার বন্ধুদের — ভুল থেকে তারা আমায় বাঁচিয়েছে।

ব্যাপারটা এই: ওরেনবুর্গে বৈমানিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে বাড়ি থেকে ভারি একটা খারাপ চিঠি পাই। বাবা অসুস্থ, মা খুব কষ্টে আছেন।

মন ছটফট করে উঠল। ভাবলাম, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাই, কারখানায় কাজ নেব...

যা ভাবছিলাম বন্ধুদের বললাম।

ওরা বললে:

'মন খারাপ করিস নে ইউরি, নেতিয়ে পড়িস না। পড়াটা শেষ কর, তখন সংসারে অনেক সাহায্য করতে পারবি।'

ভালিয়া আমার মনের অবস্থাটা বুঝেছিল। তখনো বিয়ে হয় নি আমাদের, তবে ভাব ছিল খুব। আমার জন্মদিনে সে আমায় একটি ফোটো অ্যালবাম উপহার দিয়ে লেখে 'ইউরি মনে রেখো, আমাদের সুখের কারিগর আমরাই। ভাগ্যের কাছে মাথা নুইয়ো না।'

লেখাটা পড়ে ভাবলাম, সত্যিই কি ছাত্র বৈমানিক গাগারিন বিমান বিদ্যালয় ছাড়তে চাইছিল? সত্যিই কি তার স্বপ্ন থেকে, সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হতে চায়?

যদি হত তাহলে কী হত, এ বিচার নিরর্থক। তবে ভালিয়া ও অন্যান্য বন্ধুদের সদুপদেশ যদি আমি তখন কানে না তুলতাম, তাহলে আমার জীবন যে একেবারে অন্য রকম হত, তাতে সন্দেহ নেই।

মহাকাশযানের খসড়া

ওরেনবুর্গে পড়বার সময়েই ঘটে মহাকাশ জয়ে সোভিয়েত দেশের প্রথম সাফল্য। স্পুৎনিক প্রেরণের পর আমাদের বিদ্যালয়ের লেনিন কক্ষে রেডিওর সামনে প্রচণ্ড তর্ক বেধে উঠল:

'এবার শীগগিরই মানুষ যাবে মহাকাশে...'

'শীগগির? তর দেখি তোর সইছে না! এখনো পনের কুড়ি বছর... ততদিনে বৈমানিক হিশেবে তুই পেনশন নিয়েছিস!'

'স্পুৎনিকে নিশ্চয় প্রথম যাবে কোনো বৈজ্ঞানিক। এটা যে ল্যাবরেটরি জাহাজ...'

'মোটেই সেটা অনিবার্য নয়। দরকার লোহার মতো স্বাস্থ্য। ডুবুরি কি বিমান পরীক্ষকের যা দরকার।'

'আর আমার মতে, মহাকাশে ওড়ার জন্যে কোনো ডাক্তারকেই প্রথম নেবে। মানুষের দেহে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সেইটে যাচাই করাই তো প্রধান কথা...'

বলাই বাহুল্য কোনো এক মতে আমরা পৌঁছলাম না। এমন কি ভবিষ্যৎ মহাজাগতিক জাহাজের খসড়া আঁকাও হল নানা রকমের। আমিও এ'কেছিলাম। পাঁচ বছর পরে যে 'ভস্তক-১' মহাকাশযানে বসে আমি মহাকাশ থেকে পৃথিবী দেখেছিলাম, তার সঙ্গে সে খসড়াটার কী অপার অমিল!

ভয়ানক চমক লাগল যখন শুনলাম দ্বিতীয় স্পুৎনিক ছাড়া হয়েছে ভেতরে কুকুর সমেত। ভাবলাম, জীবন্ত প্রাণী যখন মহাকাশে উঠতে পেরেছে, তাহলে মানুষই বা কেন পারবে না? তার্কিকদের যে পক্ষ ভাবত প্রথম ব্যোমনাবিক ওড়ার দিনটা বেশি দূরে নয়, সেই দলেই যোগ দিলাম আমি।

ওদিকে সময় কাটছিল। শুভ ঘটনার পালা এল। দুটো জিনিস ঘটল একই সঙ্গে। বৈমানিক স্কুল শেষ করে লেফটন্যাণ্ট পাইলটের উর্দি চড়ালাম গায়ে, আর ভালিয়াকে ঘরে তুললাম বৌ করে। ওরেনবুর্গ আমায় অনেক দিয়েছে, বিমানে রাজত্ব ও বধূ।

উরাল অঞ্চলের স্তেপভূমি থেকে আমাদের পথ গেল উত্তরে, দীর্ঘ মেরু রাত্রির রাজ্যে। সেখানেই চাকরি, সেখানেই অনুশীলন। অনেক উড়েছি, পড়াশুনো করেছি তার চেয়েও বেশি। তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ নিয়ে খাটতে হয়েছে, হাতে যা সময় থাকত তা প্রায় সবই যেত বই পড়তে।

একগাদা চ্যালাকাঠ নিয়ে ঘরে ঢুকতাম, চুল্লি জ্বালাতাম। ভালিয়া নৈশাহার তৈরি করত আর বলত:

'কিছু একটা জোরে জোরে পড়ে শোনাও না...'

গল্প উপন্যাসও আমি বাছতাম বৈমানিকদের জীবন নিয়ে। ভালিয়ারও তাতে নেশা ধরেছিল।

এইভাবেই এগিয়ে চলল, ছুটে চলল, উড়ে চলল জীবন। চাঁদের না-দেখা মুখের ফটো তুলে আনল তৃতীয় মহাকাশযন্ত্র। মনে হল, কী আশ্চর্য যাথার্থ্য। তার মানে আর দেরি নেই...

দিন কয়েক বাদেই দরখাস্ত দিলাম: ব্যোমনাবিক প্রস্তুতির গ্রুপে আমায় নেওয়া হোক, যদি অবশ্য সেরকম কোনো গ্রুপ থেকে থাকে।

এমন দরখাস্ত কেন দিলাম? বলা মুশকিল। তবে এখন তো নিঃসন্দেহেই জানা গেছে যে তেমন দরখাস্ত কেবল আমি একলাই দিই নি। অনেকেই এই ধরনের আর্জি পাঠিয়েছিল, সবাই তারা বৈমানিকও নয়।

কিছু গুণ আমার ছিল: বয়সে জোয়ান, স্বাস্থ্যবান, বিমান চালনা বা প্যারাশুট ঝাঁপের সময় কোনো অস্বস্তি বোধ করতাম না। কিন্তু কবুল

করেই বলি, দরখাস্তের ফললাভে বিশেষ ভরসা ছিল না। ভাবতাম, কত হাজার হাজার ভালো ভালো প্রার্থী আছে আমার চেয়ে।

তাই কী যে আনন্দ হয়েছিল যখন ডাক এল মস্কো থেকে। অতি খুঁটিনাটি ডাক্তারি পরীক্ষার প্রথম পর্বটা কাটল, ফের ফিরে এলাম উত্তরে। অনেক দিন কোনো চূড়ান্ত জবাব পেলাম না। ভালিয়া টের পেত যে আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছি, কিন্তু তার আসল কারণটা সে ধরতে পারে নি। কিছুই যখন ঠিক নেই তখন ব্যাপারটা তার কাছে ফাঁস করে লাভ কী! তাছাড়া আমি জানতাম যে ভালিয়া আমায় বাধা দেবে না, আমার পরিকল্পনায় সে খুশিই হবে। একই স্বপ্ন, একই প্রচেষ্টায় আমরা এক হয়ে উঠেছিলাম।

জন্মদিনটা খুবই আনন্দের একটা উৎসব। এ উৎসব পালন করে না এমন খ্যাপা আছে হয়ত হাজারে এক। আমার পঞ্চবিংশ জন্মদিনের প্রাক্কালে পেলাম বিরলতম এক উপহার: মস্কো থেকে আমন্ত্রণ। তার মানে কী সেটা বুঝতে বাকি রইল না।

'ভস্তক' জাহাজে

'আলাপ করা যাক: আমার নাম তিতোভ।'

'আমি আন্দ্রিয়ান।'

'আমি ইউরি গাগারিন।'

প্রথম দেখা, প্রথম পরিচয়। সবাই আমরা উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখলাম পরস্পরকে। সহজ সরল প্রাণোচ্ছল ছেলে সব।

সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শক্তিতে আস্থা বেড়ে উঠল।

আমাদের ঠাঁই হল মস্কোর উপকণ্ঠে একটা ছোট্ট শহরে, এখন যার নাম হয়েছে 'নক্ষত্র নগর'। অচিরেই টের পেলাম: পড়াশুনা ও খাটুনি আছে কম নয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা: সময়ও বেশি নেই, ডিজাইনার ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি কার্যত শেষ করে আনছিলেন।

নানা বিদ্যার বিশেষজ্ঞরা আমাদের তালিম দিচ্ছিলেন। রপ্ত করতে হল রকেট ও মহাজাগতিক যন্ত্রের টেকনিক, মহাকাশযানের ডিজাইন, ভূপদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ডাক্তারি। তত্ত্ব ছাড়াও দৈহিক প্রস্তুতির জন্যে সময় দিতে হল অনেক। পালা করে চলল ব্যায়াম, বল খেলা, জলে ঝাঁপ, সাইকেল দৌড়। এটা চলত নিয়মিতভাবে যে কোনো আবহাওয়ায়, সর্বদা নজর

রাখতেন ডাক্তাররা। তারপর এল বিশেষ ট্রেনিঙের পালা। চূড়ান্ত শুব্ধতার রাজ্য সুর্দোক্যামেরায়, কেন্দ্রাতিগ ঘূর্ণন যন্ত্রে, তাপকক্ষে আগুনে বাতাসের হলকায়, কৃত্রিমভাবে ওজনহীনতার অবস্থা বানানো বিমানে নানা ধরনের পরীক্ষা।

মহাকাশ পোতও তৈরি হয়ে উঠছিল। প্রথম তা দেখি ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে, স্টার্ট নেবার নয় মাস আগে। যন্ত্রটা আমাদের সবারই বেশ ভালো লাগল। তখনই আমরা শুনলাম যে ঘন বায়ুমণ্ডলে পোতের উপরিভাগ তপ্ত হয়ে ওঠে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড...

'গাগারিনের ভাবনা নেই, ঢালাইকার তো, গনগনে চুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যেস আছে ওর...' ঠাট্টা করলে একজন কমরেড।

'তবে কয়েক হাজার ডিগ্রিটা নিশ্চয় ইউরির পক্ষেও একটু বেশি হবে,' বললে আরেকজন।

'দেখা যাক, গলে যাব না নিশ্চয়!'

এইখানেই আমরা জাহাজের তাপনিরোধ ব্যবস্থাটা দেখলাম। একটু আগু বেড়েই বলি, আমাদের সমস্ত ওড়াতেই কেবিনের ভেতরকার তাপমাত্রা স্বাভাবিক ছিল।

জাহাজটার কথা একটু বলি। 'ভস্তক-১'এর সঙ্গে পরেকার জাহাজগুলোর তফাৎ আছে, তবে মূলনীতিটা একই। মহাকাশযানের দুটি অংশ। একটিকে বলা যায় 'বাসকক্ষ', পাইলটের কেবিন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানো আছে তাতে। অন্যটি হল গতিরোধক যন্ত্র, জাহাজের মাটিতে নামার ব্যবস্থা।

কেবিনের সবচেয়ে বড়ো জিনিসটা হল আরামকেদারা। তার সঙ্গেই ক্যাটাপাল্ট ব্যবস্থাটা সংযুক্ত, অনেকটা জেট বিমানের মতো। কম্যাণ্ড দিলেই জাহাজ থেকে মানুষ সমেত কেদারাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া কেদারার সঙ্গেই লাগানো আছে ত্রাণ নৌকো, খাদ্য সম্ভার, যোগাযোগের জন্যে বেতার যন্ত্র, ওষুধপত্র।

পাঠকেরা সম্ভবত অনেকেই টেলিভিশন বা সিনেমায় জাহাজের ভেতরকার সাজসরঞ্জামগুলো দেখেছেন। জটিল সব রেডিও-টেকনিকাল ও আলোক যন্ত্র আছে সেখানে। জাহাজের বাইরে কী ঘটছে সেটা পাইলট দেখতে পায় ইলিউমিনেটর বা গবাক্ষ দিয়ে। কাচটা তার খুবই মজবুত, কোনো ধাতুর কাছেই হারবে না। তাহলেও প্রচণ্ড সূর্য কিরণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে—সে কিরণ পৃথিবীতে আমরা যে রোদ দেখি তার মতো নয়। তাই গবাক্ষের সঙ্গে আছে বিশেষ ধরনের পর্দা।

নানা ধরনের কলকব্জা ও যন্ত্র আছে কেবিনে, তাতে ভেতরে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা, বায়ু, আদ্রতা, অক্সিজেনের অনুপাত ইত্যাদি যে সব ব্যাপার ব্যোমনাবিকের জীবনরক্ষা ও কর্মশক্তির জন্যে দরকার, তার ব্যবস্থা হয়। স্টার্ট থেকে মাটিতে নামা পর্যন্ত সর্বত্রই একেবারে যথাযথ হিশেবনিকেশের একটা ব্যবস্থাও ছিল।

কলকব্জার প্রত্যেকটাই নিখুঁতভাবে চলে। একটা যন্ত্রের কথা একটু বলি। দেখতে সেটা গ্লোবের মতো, প্রত্যেক ইশকুলেই যা থাকে একেবারে ঠিক সেই ধরনের গ্লোব। ওড়বার সময় গ্লোবটা ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। ওইটা দিয়ে আমরা যে কোনো মুহূর্তেই ধরতে পারতাম পৃথিবীর ঠিক কোন বিন্দুর ওপর দিয়ে আমাদের জাহাজটা তখন উড়ছে। জাহাজটা চালানোর ব্যবস্থা এতই নিখুঁত যে আমরা ব্যোমনাবিকেরা আমাদের বিজ্ঞানী ও ডিজাইনারদের কীর্তিতে খোলাখুলি উল্লাসে ফেটে পড়ি।

তোমরা জানো যে মহাকাশে জাহাজকে পেঁছে দেয় একটা বহুধাপী রকেট। 'ভস্তক' নির্দিষ্ট উচ্চতায় পেঁছনো মাত্র তা বাহক রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই উড়তে থাকে। গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় আট কিলোমিটার।

যে রকেটটা 'ভস্তক'কে কক্ষপথে স্থাপন করেছিল, তার ইঞ্জিনের মোট শক্তি ছিল প্রায় দু'কোটি অশ্বশক্তি।

একশ' আট মিনিট

এখন এটা এক প্রথায় দাঁড়িয়েছে: কসমোড্রমে রওনা দেবার আগে ব্যোমনাবিকরা লাল ময়দান, ক্রেমলিন ও ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের ম্যুজোলিয়ম দর্শন করে যান।

আমিও একদিন গেলাম, মস্কো তখনো তুহিন, তাহলেও বসন্তের আমেজ লেগেছে।

গোর্কি স্ট্রিট দিয়ে হাজার হাজার লোক হেঁটে আসছে আমার দিকে, আমায় ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। স্বভাবতই ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবে নি যে বড়ো একটা ঘটনার আয়োজন হচ্ছে, ইতিহাসে যা কখনো হয় নি। ক্রেমলিন প্রাচীরের কাছে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একটু, আরেকবার তাকালাম লেনিন ম্যুজোলিয়মের দিকে, গেলাম মস্কো নদীর দিকে... সেই রাতেই বিমানে বাইকনুরে রওনা দিলাম।

আমার সঙ্গেই রওনা দিলেন গেরমান তিতোভ, আরো কিছু ব্যোমনাবিক,

একদল বৈজ্ঞানিক কর্মী, ডাক্তার। দরকার হলে 'ভস্তক'এর কেবিনে আমার জায়গায় বসবার জন্যে গেরমান তৈরি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, কোন দিন ওড়া হবে সেটা যেন আমাদের না জানানো হয়, তাতে নাকি স্নায়ু বিকল হতে পারে। দেখা গেল তাঁদের আশঙ্কাটা সত্যি নয়।

আমি বা গেরমান, দুজনেরই মেজাজ ছিল তোফা।

তৈরি হয়েই ছিলাম আমরা। তবে রাষ্ট্রীয় কমিশনের দীর্ঘ প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত শোনানো হল কেবল কসমোড্রমে। আমি নির্বাচিত হয়েছি 'ভস্তক-১' জাহাজের কম্যান্ডার, গেরমান তিতোভ আমার ডাব্‌ল্‌।

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত আমি আর গেরমান ওড়ার পরিকল্পনাটা বিশ্লেষণ করে কাটালাম, কাণ্ডটার সমস্ত দিকগুলো রপ্ত করলাম। ওড়ার সময় যে সব প্রক্রিয়া পালন করার কথা তা মনে রাখতে হল। আমাদের সাহায্য করলেন মহাকাশযানের নির্মাতা এবং বড়ো বড়ো সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

মহাজাগতিক পথ্যেও অভ্যস্ত হয়ে নিলাম, বিশেষ ধরনের সব টিউব থেকে সেখানে খেতে হবে নানা রস আর লেই।

ওড়ার আগের দিনটা রইল পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্যে। ছোট্ট একটা বাড়িতে ছিলাম আমি আর গেরমান। মৃদু সঙ্গীত চলল সারা দিন। ওড়া নিয়ে আমরা কোনো কথা বললাম না। আলাপ চলল কেবল ছেলেবেলায় কী ঘটেছিল, কী বই পড়েছি, কী ফিল্ম দেখেছি, তাই নিয়ে। নিজেদের জীবনের নানান মজার ঘটনার কথা বলে আমরা হাসাহাসি করলাম। আমাদের সঙ্গে প্রায় সারাক্ষণই ছিলেন ডাক্তার, তাছাড়া দেখতে এসেছিল দলের লোকেরা, এসেছিলেন প্রধান নির্মাতা।

শুতে গেলাম রাত নয়টায়। মনে হয় কোনো স্বপ্ন দেখি নি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় আমায় জাগিয়ে দিলেন ডাক্তার। গেরমানও উঠল বরাবরের মতোই এক কলি রগুড়ে গান গেয়ে। শেষ পরীক্ষা সাঙ্গ হল। সবই ঠিক আছে।

ওড়ার পোষাক পরানো হল আমায়। এইখানেই মনে হয় জীবনের প্রথম অটোগ্রাফ দিই আমি।

তারপর বিশেষ একটা বাসে উঠলাম আমি আর গেরমান। এইখান থেকেই শুরু হল আমার মহাজাগতিক জীবন। হাওয়া জোগানোর যন্ত্রটা লাগানো হল পোষাকে।

আকাশচুম্বী বিশাল রকেটটার পাদদেশে বিদায় নিলাম সকলের সঙ্গে, লিফটে করে উঠলাম রকেটের মাথায়। তার কিছু আগে যে বিবৃতি

দিয়েছিলাম সেটা অনেকেরই মনে আছে। কাগজে তা ছাপা হয়েছিল, প্রচারিত হয়েছিল রেডিওয়। তাহলেও তার কয়েকটা পঙক্তি তুলে দিতে ইচ্ছে করছে। ওড়ার আগে আমার মানসিক অবস্থা, আমার আবেগ অনুভূতির নিখুঁত প্রতিফলন তাতে পাওয়া যাবে:

'মহাকাশের পথে যাচ্ছি বলে কি আমি খুশি? নিশ্চয় খুশি। কেননা সর্বকালে ও সর্বযুগেই একটা নতুন আবিষ্কারে অংশ নিতে পারাই লোকের মহত্তম সুখ। এই প্রথম মহাকাশযাত্রাটাকে আমি উৎসর্গ করতে চাই কমিউনিজমের লোকেদের উদ্দেশে — আজ সোভিয়েত জনগণ এই যে সমাজটায় পদার্পণ করছে, পৃথিবীর সমস্ত লোকই তাতে পেঁছবে বলে আমি নিঃসন্দেহ। স্টার্টের আগে এখন সামান্য কয়েক মিনিট বাকি।

'লোকে যখন দীর্ঘ যাত্রায় রওনা হয় তখন তারা পরস্পরকে বলে 'আবার দেখা হবে'। প্রিয় বন্ধুরা, আমিও আপনাদের সেই কথাই বলছি। কী ইচ্ছেই না হচ্ছে চেনা অচেনা, দূর নিকট আপনাদের সকলকেই আলিঙ্গন করতে!'

তারপর কৃত্রিম আলোয় আলোকিত অসংখ্য যন্ত্রপাতির মধ্যে আমি গিয়ে বসলাম একা। বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ রইল কেবল রেডিও মারফত।

বলাই বাহুল্য আমার বুক দুরদুর করছিল, এই রকম মুহূর্তে ও এই রকম পরিস্থিতিতে অবিচল থাকতে পারে কেবল রোবট। তবে সেই সঙ্গেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে যাত্রা সফল হবে, এমন কিছুই ঘটবে না, যা আমাদের বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়নদের নজর এড়িয়ে গেছে। রকেট, ওড়ার পোষাকটা, যন্ত্রপাতিগুলো, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ, খাদ্যের উৎকর্ষ — এসবের ত্রুটিহীনতা সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এই সব জিনিসগুলোকে একত্রে ধরলেই তো দাঁড়ায় সেইটে, যাকে বলে 'মহাকাশ যাত্রায় প্রস্তুত'।

'স্টার্টের আগে কেবিনের কেদারাটায় বসে কী ভাবছিলাম আমি? রেডিও যোগাযোগের ব্যবস্থাটা আগেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। গান চলছিল তখন: আমার যাতে একলা না লাগে তার জন্যেই বন্ধুদের পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা। হাতে সময় ছিল ষাট মিনিট।

মানবিক চিন্তার গতিবেগ কী, ঘণ্টায় কতখানি সে পাড়ি দিতে পারে সেটার এখনো হিশেব হয় নি। মনে পড়ছিল বহুকাল আগের একটা দিন, আমার গলায় যখন পাইওনিয়রের টাই বেঁধে দেওয়া হয়। জানতাম, পাইওনিয়র মানে 'অগ্রগামী' 'পথিকৃৎ'। চমৎকার কথাটা!

ফের আমায় পাইওনিয়র হতে হচ্ছে, মহাকর্ষের রাজ্য পেরিয়ে পৃথিবীর ক্রোড়চ্যুত প্রথম মানুষ। যুগ যুগ ধরে মানুষের সমস্ত স্পর্ধিত স্বপ্নের মধ্যে এইটেই ছিল সবচেয়ে অসাধ্য, সবচেয়ে অপরূপ।

রকেট ইঞ্জিন চালু হল ৯টা ৭ মিনিটে। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে লাগল অতিচাপ। আক্ষরিক অর্থেই আমি কেদারায় পিষে গেলাম। বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরটা থেকে 'ভস্তক' বেরিয়ে আসতেই পৃথিবী দেখলাম। জাহাজ উড়ছিল চওড়া সাইবেরীয় নদীর ওপর দিয়ে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল তার চড়া, রোদে ঝলমল বনময় তীর।

কখনো দেখছিলাম আকাশ, কখনো পৃথিবী। বেশ ধরা যাচ্ছিল পাহাড়ে শিরা, প্রশস্ত হ্রদ। এমন কি মাঠও চোখে পড়ছিল।

সবচেয়ে অপরূপ দৃশ্যটা ছিল দিগন্তে — রামধনুর পুরো সাতটি রঙের মেখলা সেখানে, ঘোরকৃষ্ণ আকাশ থেকে রোদে ভরা পৃথিবীকে তা তফাৎ করে রেখেছে। পৃথিবীর গোলাকৃতি ও উত্তল পৃষ্ঠদেশও চোখে পড়ল। মনে হল যেন তা মৃদু নীলের জ্যোতিতে ঢাকা, ফিরোজা, নীল ও বেগুনির বলয় পেরিয়ে তা মিশে গেছে নীলাভ কালোয়।

ওজনহীন অবস্থাটায় আমি তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিই, তবে খুবই বিচ্ছিরি রগড় শুরু করল তা। লগ বুকে প্রথম লেখাটা টোকার পর পেনসিলটা ছেড়ে দিই, সেও ম্যাপ রাখার ব্যাগটার সঙ্গে অবাধে ভেসে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যে সুতোটা দিয়ে তা বাঁধা ছিল, তার গিঁটটা হঠাৎ খুলে যায়। পেনসিলও অমনি কেদারার নিচে কোথায় গিয়ে সেঁধোয়, পরে আর তাকে দেখাই যায় নি। পরের পর্যবেক্ষণগুলো পাঠাতে হয়েছিল রেডিও যোগে, অথবা রেকর্ড করে রাখি টেপে।

এই সামান্য দুর্ঘটনাটি ছাড়া অভাবিত কিছুই ঘটে নি। ওড়ার যে ছকটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল, তা মেনে চললাম কাঁটায় কাঁটায়। পৃথিবীতে আগেই আমরা যা হিশেব করে রেখেছিলাম, একেবারে অবতরণ পর্যন্ত সবই হল সেইভাবেই।

১০টা ২৫ মিনিটে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চালু হল গতিরোধক যন্ত্র। বায়ুমণ্ডলের ঘনস্তরে ঢুকল জাহাজ। গবাক্ষ ঢাকা পর্দার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ল রক্তিম ঝলক, জাহাজ ঘিরে আগুন ফুঁসছে। ওজনহীনতা বিদায় নিলে, ক্রমবর্ধমান অতিচাপ আমায় ফের চেপে ধরল কেদারার সঙ্গে। ওঠার সময়কার চেয়ে এখনকার অতিচাপটা যেন বেশি জোরালো।

স্টার্টের পর ১০৮ মিনিট বাদে ১০টা ৫৫ মিনিটে 'ভস্তক' নিরাপদে

এসে নামল স্মেলোভ্কা গাঁয়ের কাছে 'লেনিনের পথ' কলখোজের মাঠে।

আমার জ্বলজ্বলে কমলা রঙের ওড়ার পোষাকে নিশ্চয় ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল আমায়।

প্রথম মর্তবাসী, একটি নারী ও একটি খুকি ভয় পাচ্ছিলেন আমার বেশি কাছে আসতে। এঁরা হলেন আন্না আকিমভনা তাখ্তারভা ও তাঁর নাতনি রিতা।

তারপর খেতের কাজ থেকে ছুটে এল মেকানিকরা। কোলাকুলি করলাম আমরা, চুমু খেলাম। অসম্পূর্ণ যে দুঘণ্টা আমি মহাকাশে ছিলাম, তার মধ্যে সারা বিশ্বে এবং এখানেও খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিল রেডিও। যাদের সঙ্গে দেখা হল, আমার নাম তাদের আগেই জানা।

'ভস্তক' নামে একটা গভীর খাদ থেকে কয়েক দশক মিটার দূরে — বরফ গলা জলস্রোত ফুঁসছিল সেখানে। কালচে মেরে গিয়েছিল জাহাজটা, পোড়া পোড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তাকে আরো সুন্দর আর আপনজন বলে মনে হল।

নতুন স্টার্টের প্রতীক্ষায়

অলক্ষিত ও অজ্ঞাত এই যে লোকটা আমি, ওড়ার পর সেই আমার পক্ষে সন্ধ্যার মস্কোয় হেঁটে বেড়ানো, লাল ময়দানে একটু পায়চারি করা হয়ে দাঁড়াল অসম্ভব। জনপ্রিয়তা এমন একটা ব্যাপার, যার প্রতিকার নেই। শুধু ভাবতে হয়: সে জনপ্রিয়তার জন্যে কিসের কাছে, কার কাছে তুই ঋণী।

একবার এক বিদেশী সাংবাদিক আমায় বলেছিলেন:

'মিঃ গাগারিন, ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিলের পর আপনার যা নাম ছড়িয়েছে তাতে ক্লান্তি লাগছে না আপনার? এখন নিশ্চয় সারা জীবন আপনি বসে কাটাতে পারেন...'

'বসে কাটাব?' আপত্তি করেছিলাম আমি, 'আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে সবাই কাজ করে, সবচেয়ে বেশি খাটে সবচেয়ে বিখ্যাতরা, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আর সমাজতান্ত্রিক শ্রমের নায়কেরা। হাজার হাজার এই ধরনের লোক আছে দেশে, আরো ভালোভাবে খাটার, নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে অন্যদের টানার জন্যে চেষ্টা করে যান তাঁরা।'

মহাকাশে প্রথম ওড়ার পর আমাদের কাজ ফুরোয় নি, বরং বেড়েছে।

সবাই আমরা বিদ্যার্জন চালিয়ে যাচ্ছি। মহাকাশযাত্রার জ্ঞান সম্পূর্ণ করছি। ব্যোমনাবিক বাহিনী থেকে ছুটি নিই নি আমরা, প্রতিদিন খেটে যাচ্ছি আমাদের পাঠকক্ষে আর ল্যাবরেটরিতে, পরবর্তী দলের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে চমৎকার চমৎকার সব লোক। আমাদের চেয়ে তাদের কাজটা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। সহজ, কেননা অনেক জিনিসই ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে। কঠিন, কেননা প্রতিবারেই অর্পিত কর্মভারটা হচ্ছে জটিলতর, যন্ত্রটাও।

আশা করি আমার বন্ধুরা আমায় মাপ করবেন, যদি আমাদের সকলকার গোপন কথাটা এখানে ফাঁস করি: মহাকাশ থেকে ফেরার পর আমাদের একজন কোনো ব্যোমনাবিকও আমাদের নীল গ্রহটায় আরো একবার দৃষ্টিপাত করার বাসনা ত্যাগ করে নি...

পৃথিবী দেখছি

বিমানের সঙ্গে গাগারিনের জীবন গাঁটছড়ায় বাঁধা। নিজে নিজে প্রথম বিমান চালাতে পারার পর থেকেই তিনি টের পান সারা জীবনেও তাঁর আকাশ-প্রেম মুছবে না।

'জন্মদিনটা খুবই আনন্দের একটা উৎসব,' ইউরি গাগারিন লিখেছেন, 'এ উৎসব পালন করে না এমন খ্যাপা আছে হয়ত হাজারে এক। আমার পঞ্চবিংশ জন্মদিনের প্রাক্কালে পেলাম বিরলতম এক উপহার: মস্কো থেকে আমন্ত্রণ। তার মানে কী সেটা বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের ঠাঁই হল মস্কোর উপকণ্ঠে একটা ছোট্ট শহরে, এখন যার নাম হয়েছে 'নক্ষত্র নগর'।'

জঙ্গী বিমানের প্রথম শ্রেণীর পাইলট ইউরি গাগারিন তৈরি হতে লাগলেন মহাকাশ যাত্রায়।

ব্যোমযান 'ভস্তক'এর কেবিনে বসার আগে তাঁকে যেতে হয়েছে কেন্দ্রাতিগ ঘূর্ণন, সুর্দো-ক্যামেরা, চাপ-কক্ষ, তাপ-কক্ষ, বিমানচালনা, প্যারাশুটে ঝাঁপ, প্রত্যহ তাত্ত্বিক পাঠ, জটিল যন্ত্রপাতি ও জাহাজের কলকব্জা রপ্ত করার মধ্যে দিয়ে।
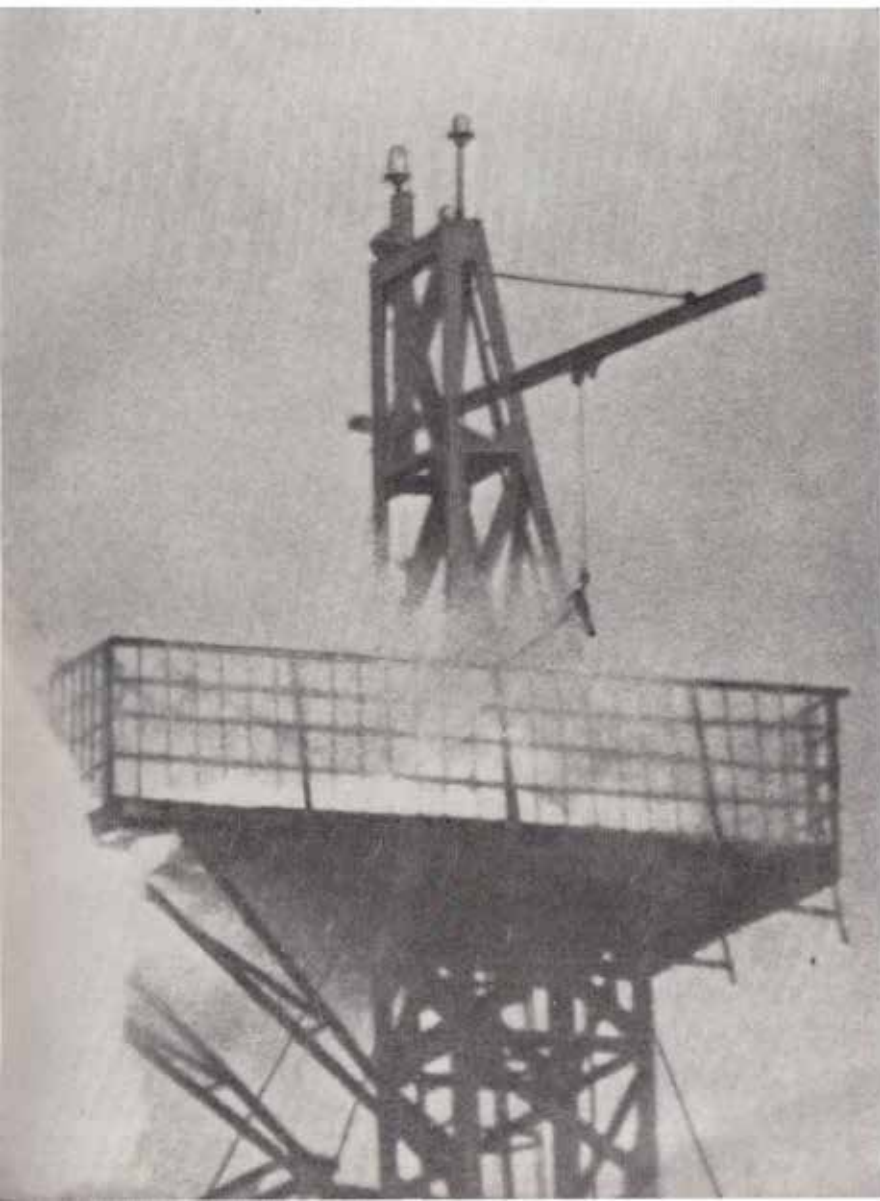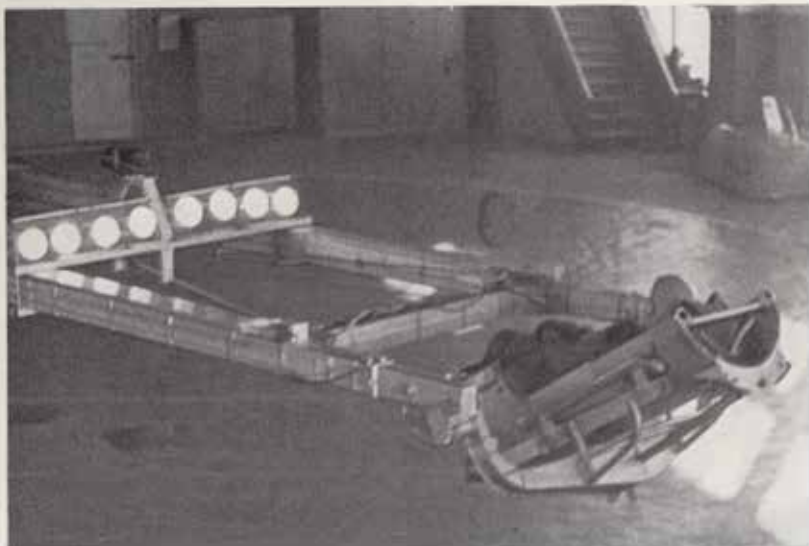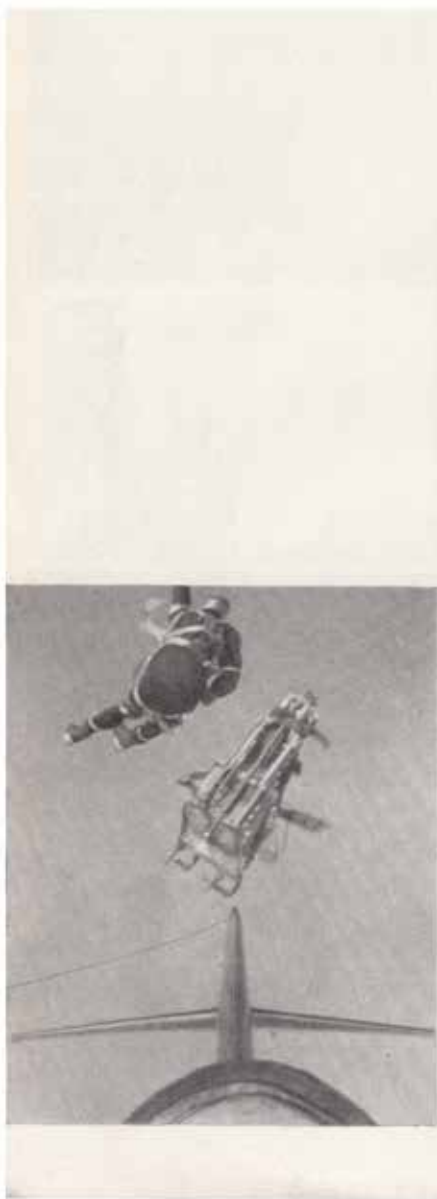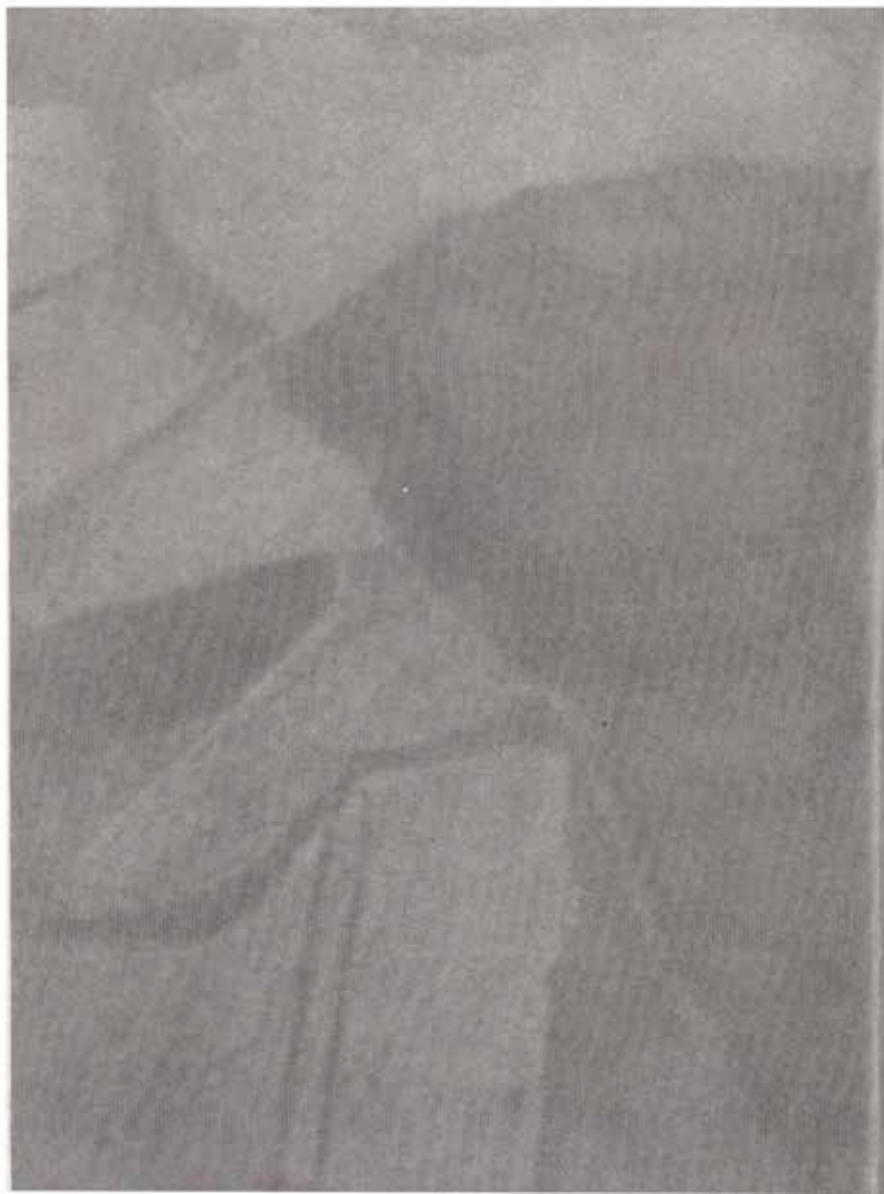
ইউরি গাগারিন: 'মহাকাশ পোতও তৈরি হয়ে উঠছিল। প্রথম তা দেখি ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মে, স্টার্ট নেবার নয় মাস আগে।'
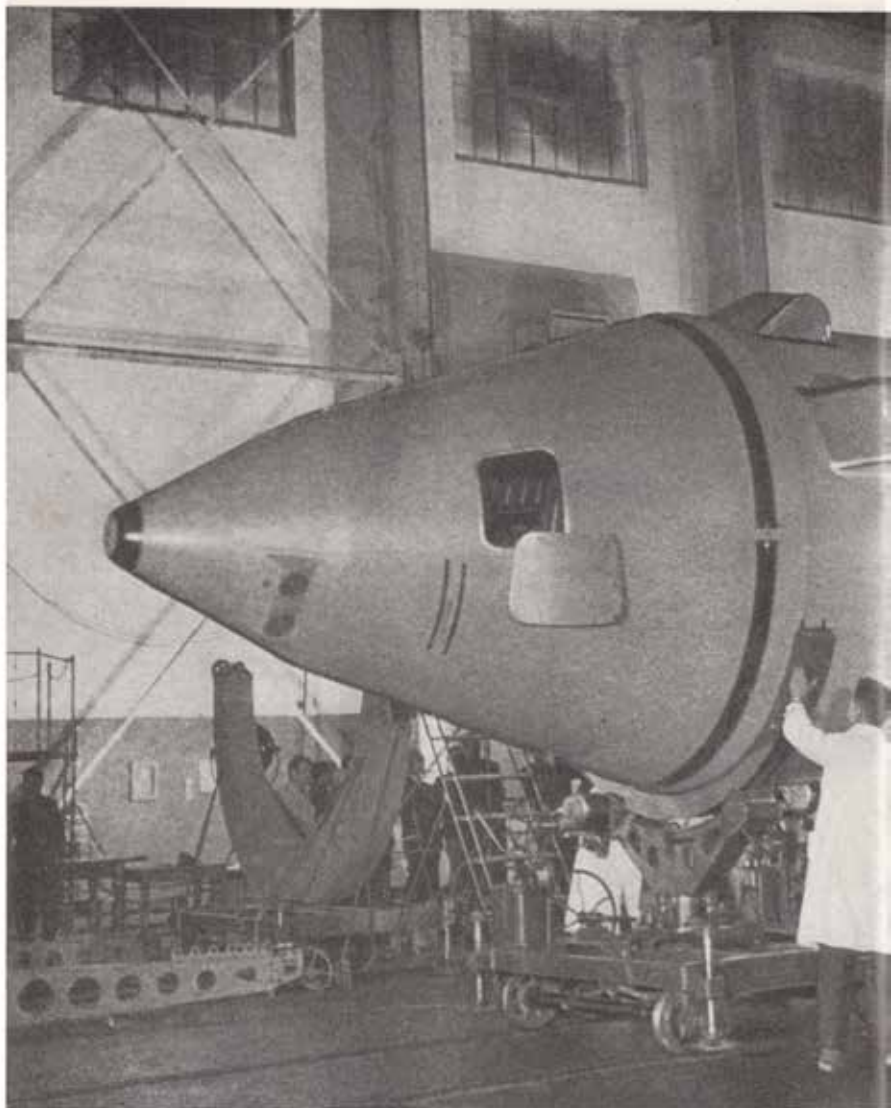
বিরাট এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাফল্যে গাগারিন নিঃসন্দেহ ছিলেন, যাঁরা তাঁর মহাকাশ যাত্রার আয়োজন করছিলেন তাঁদের সকলেই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ে সংক্রামিত হয়ে ওঠেন। 'তৈরি হয়েই ছিলাম আমরা,' লিখেছেন তিনি। 'তবে রাষ্ট্রীয় কমিশনের দীর্ঘ প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত শোনানো হল কেবল কসমোড্রমে। আমি নির্বাচিত হয়েছি 'ভস্তক-১' জাহাজের কম্যাণ্ডার, গেরমান তিতোভ আমার ডাব্‌ল্‌।'
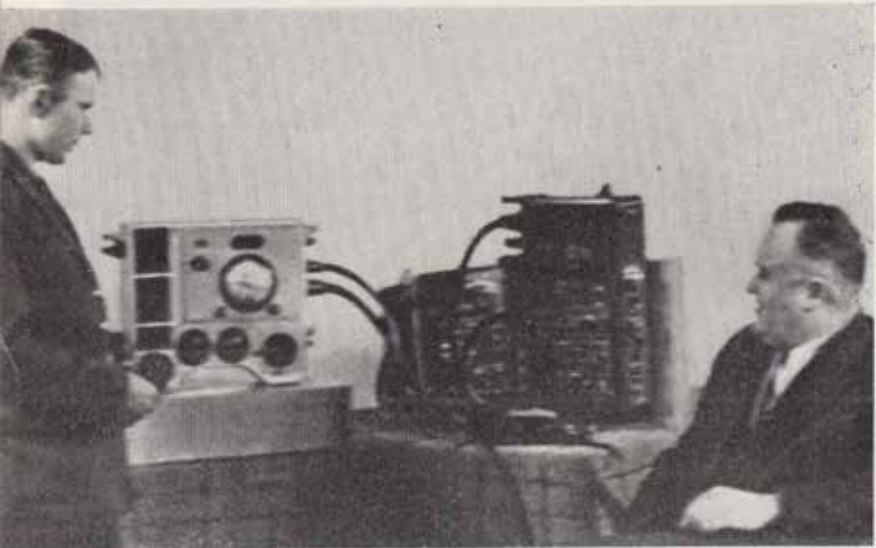
বাহক রকেট সমেত মহাজাগতিক জাহাজ 'ভস্তক'।
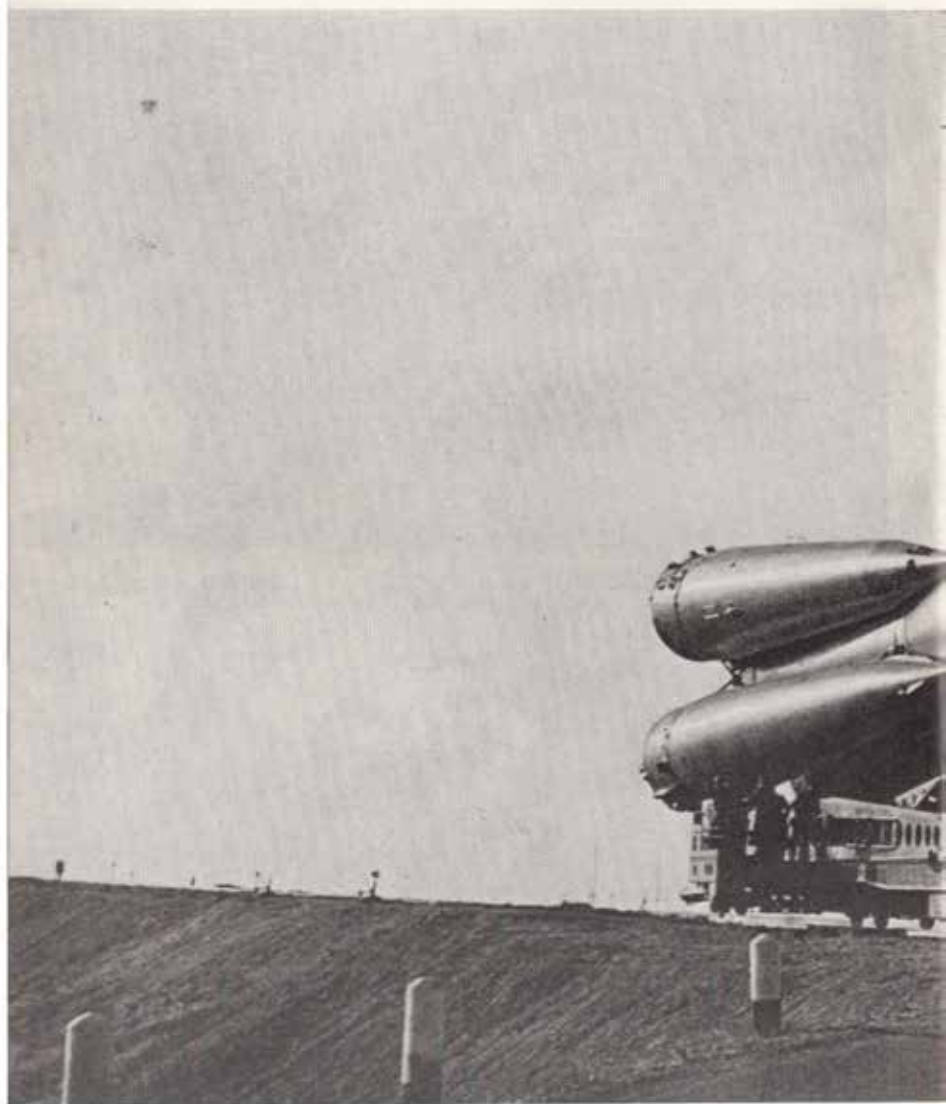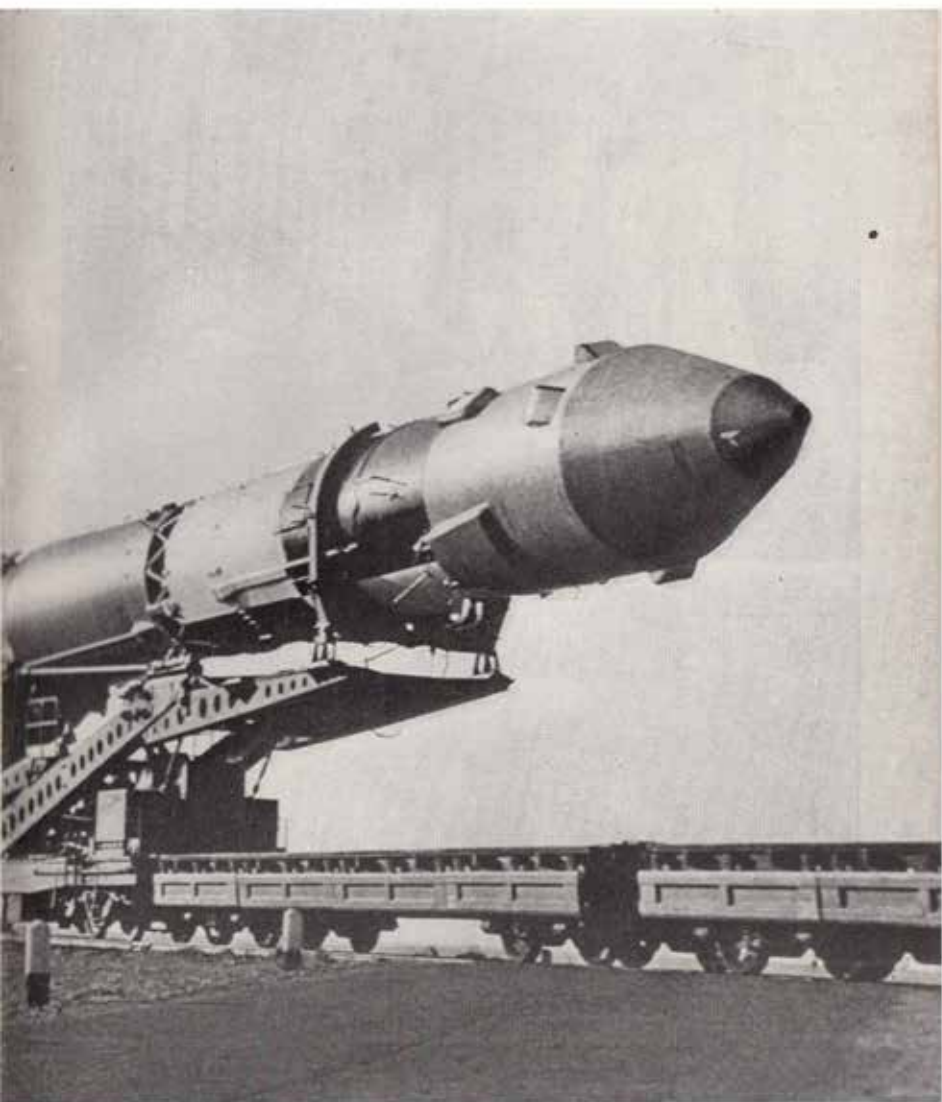
'শেষ পরীক্ষা সাঙ্গ হল। সবই ঠিক আছে... ওড়ার পোষাক পরানো হল আমায়,' বলেছেন ইউরি গাগারিন, 'এইখানেই মনে হয় জীবনের প্রথম অটোগ্রাফ দিই আমি।'

'তারপর বিশেষ একটা বাসে উঠলাম আমি আর গেরমান। এইখান থেকেই শুরু হল আমার মহাজাগতিক জীবন।'

স্টার্টের আগে গাগারিন বলেন, 'মহাকাশে প্রথম যাওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে অভূতপূর্ব এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে একলা নামা, এর চেয়ে বড়ো স্বপ্ন আর কী আছে?'
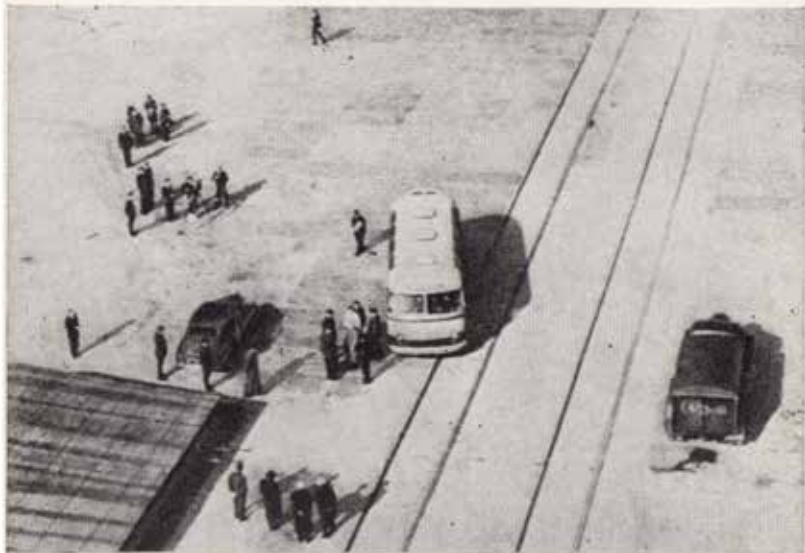
স্টার্টের আগে শেষ মুহূর্ত।
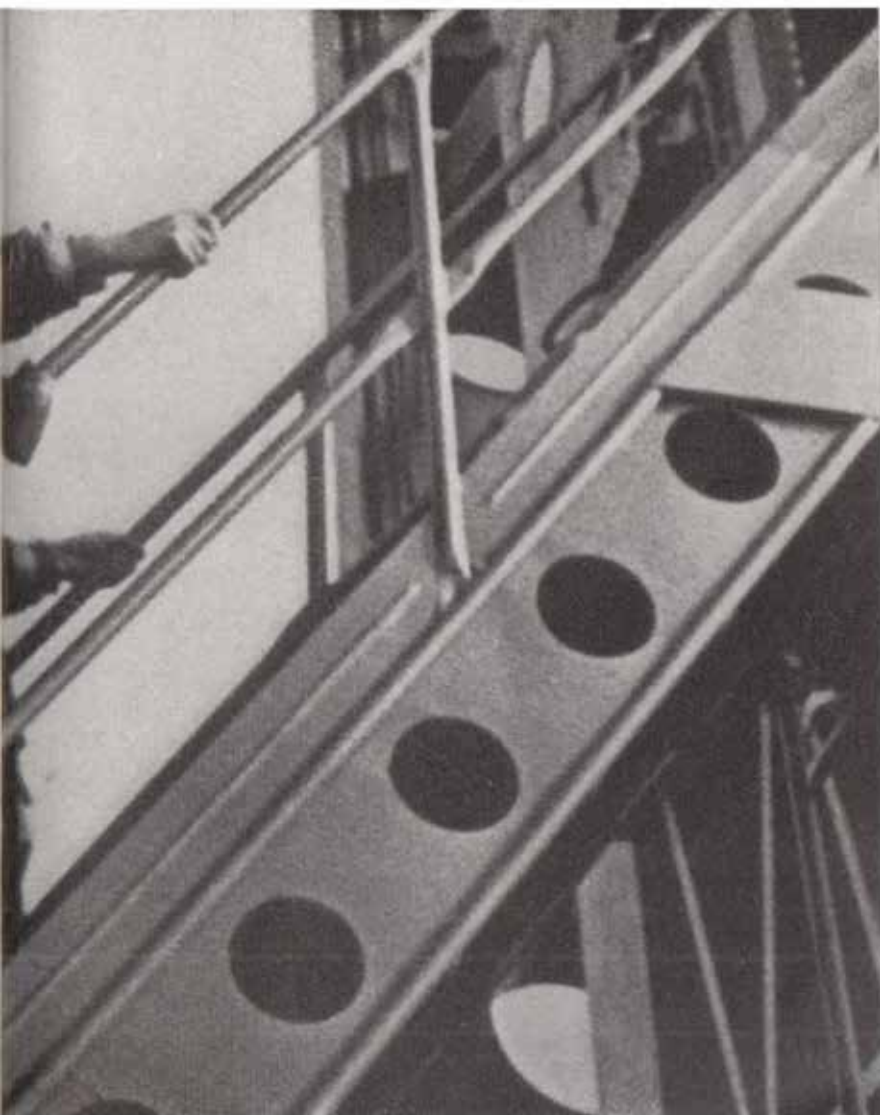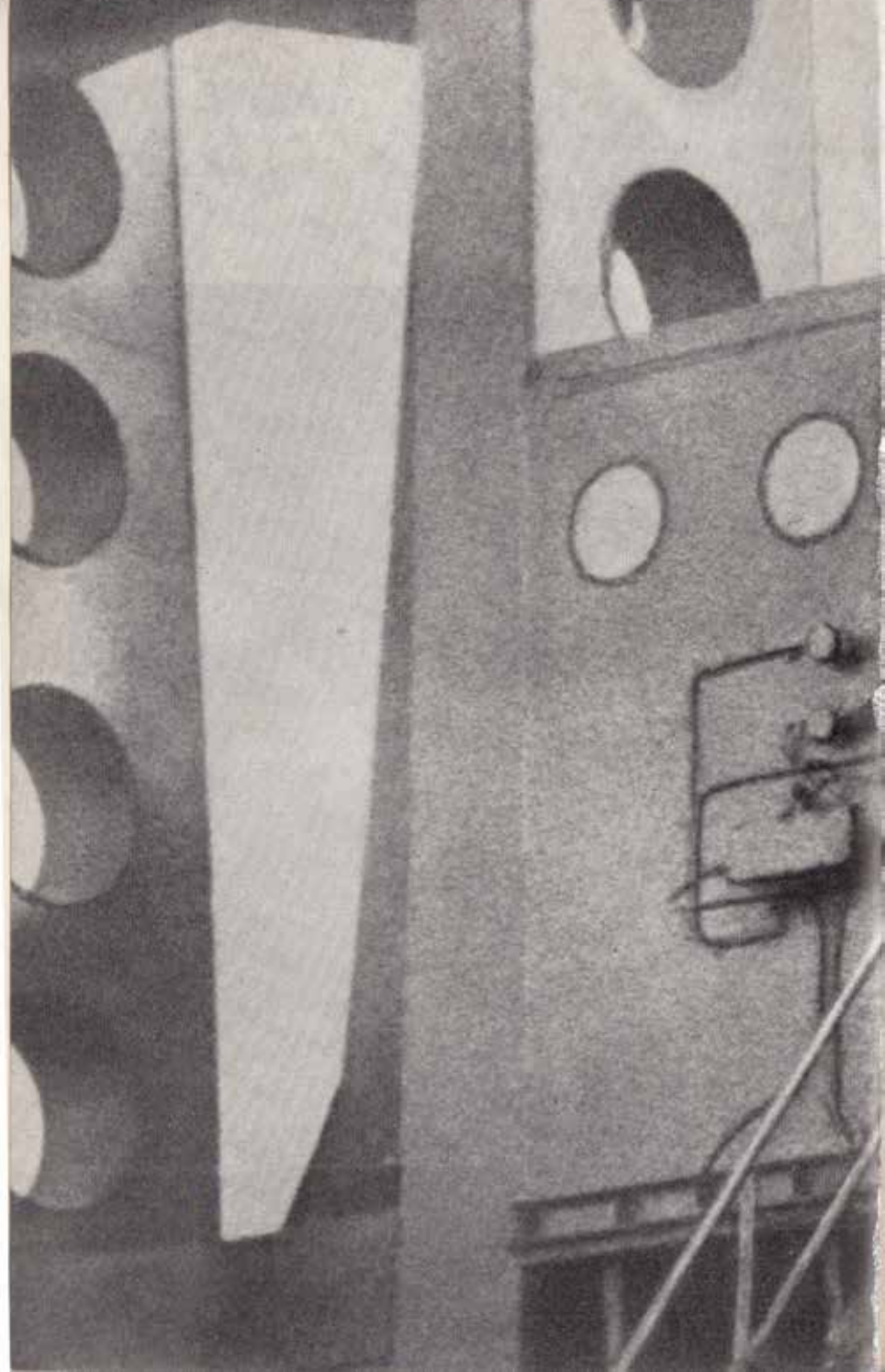
'জাহাজের সমস্ত যন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করছে! স্টার্টের জন্যে আমি তৈরি!'
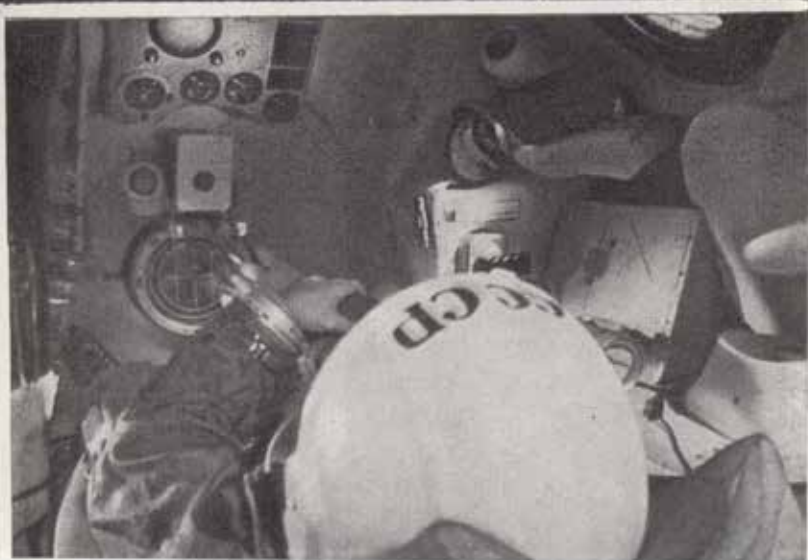
১২ই এপ্রিল, ১৯৬১ সাল, মস্কোর সময় ৯টা ০৫ মিনিট, ০৬, ০৭... স্টার্ট! 'চল-লা-ম!'

স্টার্টের পরে...

কসমোড্রমে রকেট ও মহাজাগতিক যান ব্যবস্থার এক অসাধারণ ডিজাইনার আকাদেমিশিয়ান সের্গেই পাভলোভিচ করোলেভ।
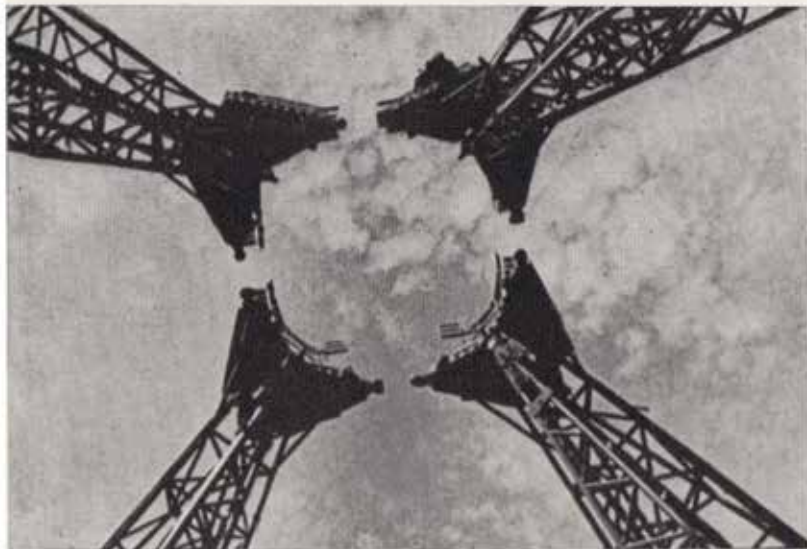
পৃথিবীর সঙ্গে নিখুঁত যোগাযোগ ছিল 'ভস্তক'এর।

পৃথিবী দেখছি

মস্কো, রাস্তায় লাখো লাখো লোক।

СКОМУ КОСМОНАВТУ
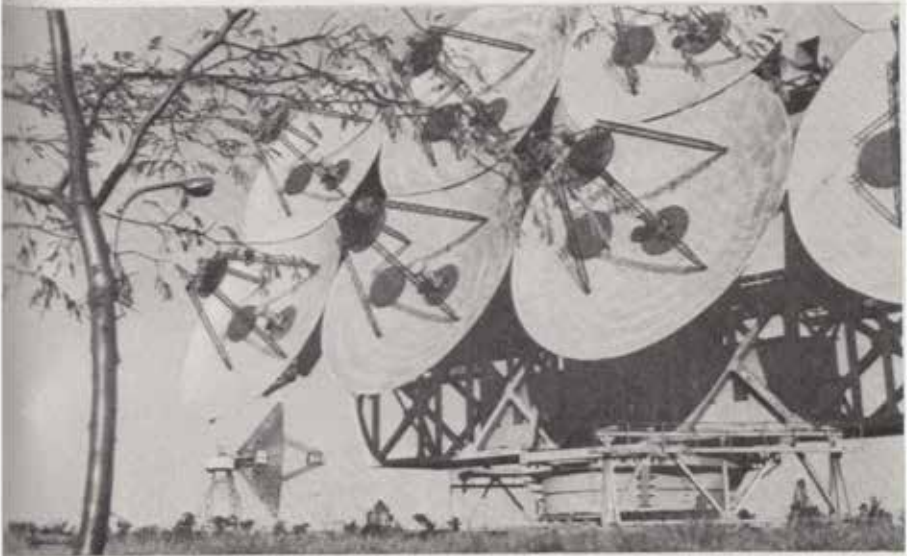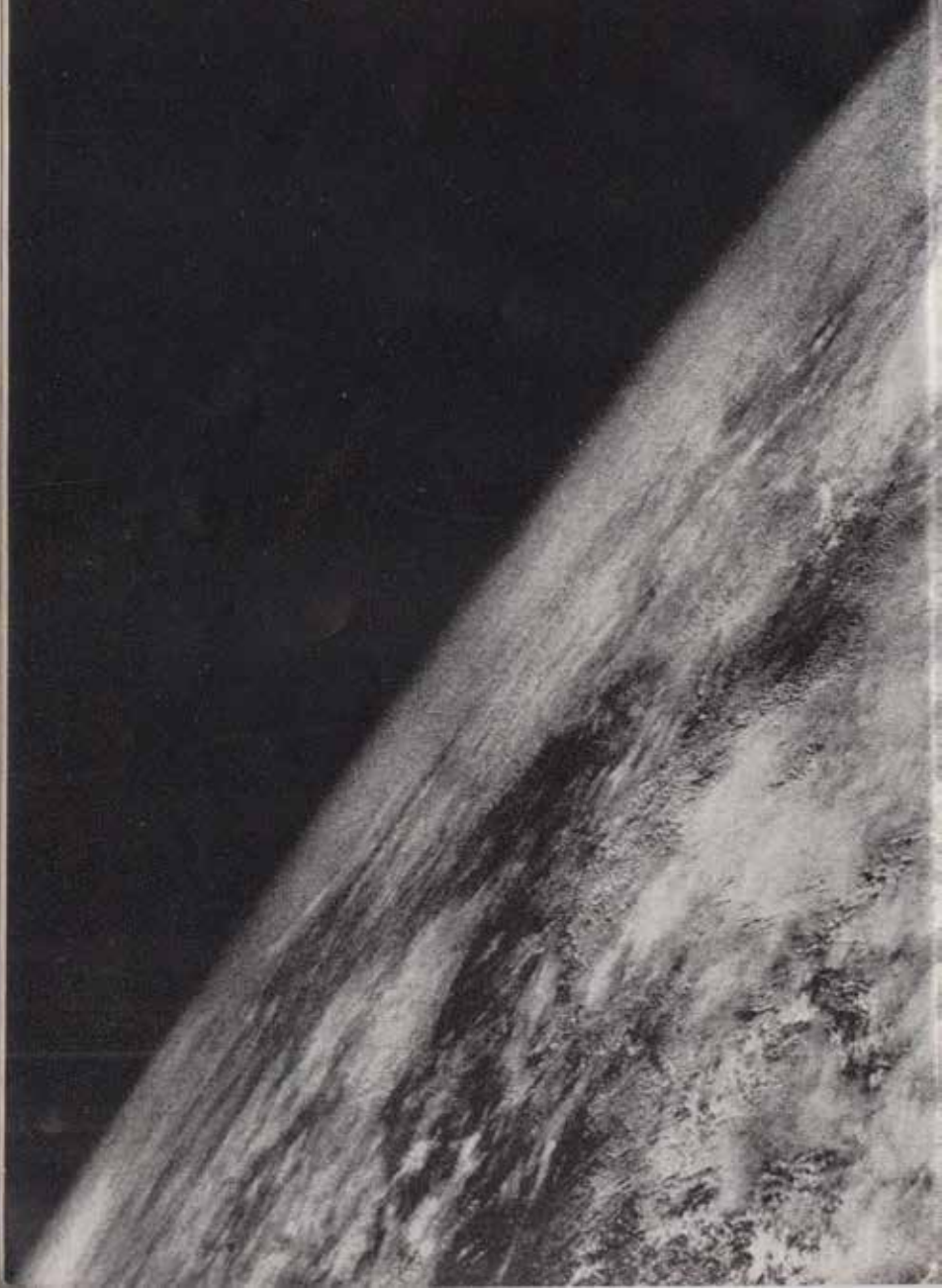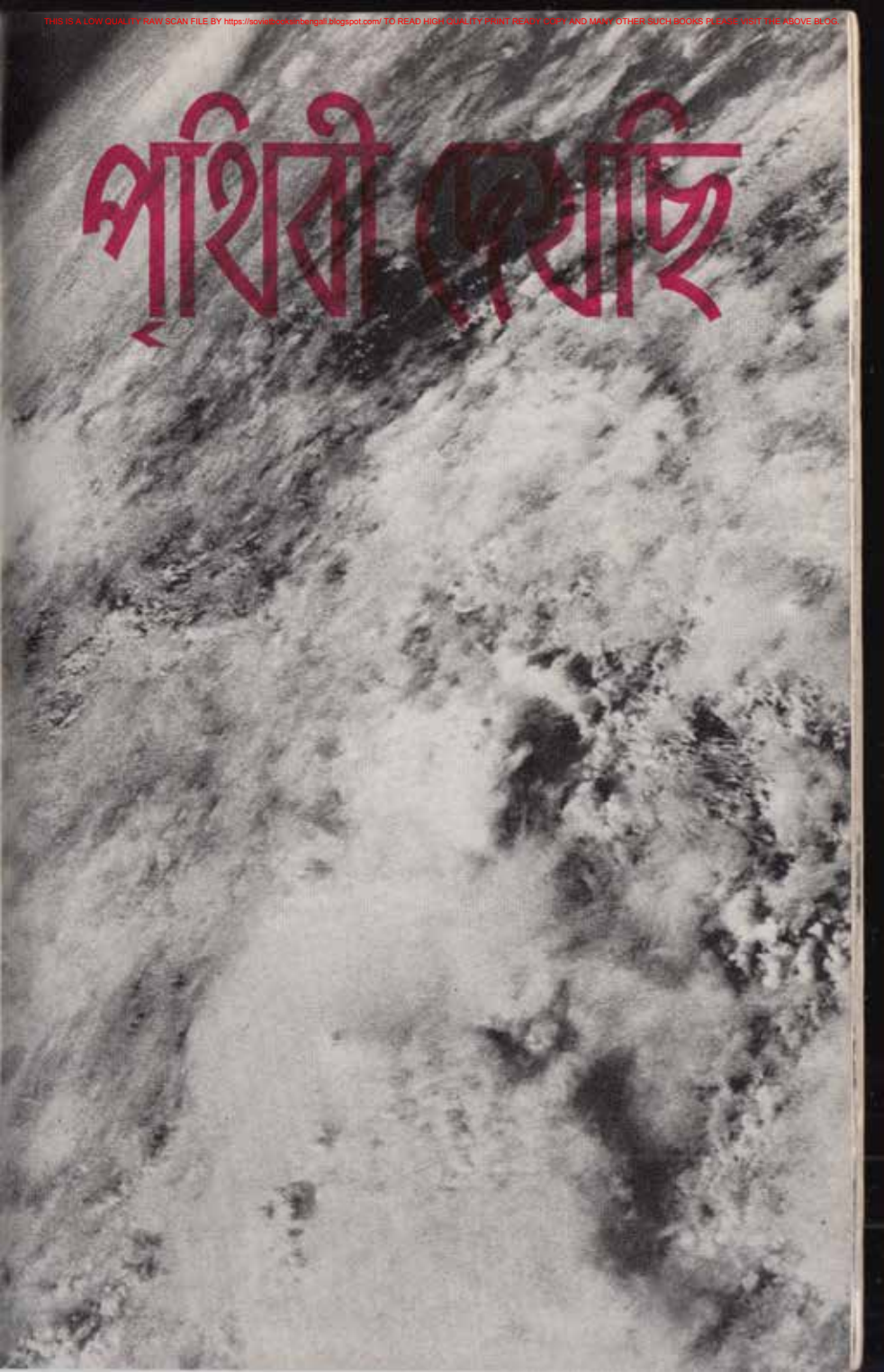
উল্লসিত খবর দিলে রেডিও: স্টার্টের পর ১০৮ মিনিট বাদে ১০টা ৫৫ মিনিটে 'ভস্তক' নিরাপদে এসে নেমেছে স্মেলোভ্কা গাঁয়ের কাছে 'লেনিনের পথ' কলখোজের মাঠে।

বিশ্বের প্রথম ব্যোমনাবিক বলেন, 'কালচে মেরে গিয়েছিল জাহাজটা, পোড়া পোড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তাকে আরো সুন্দর আর আপনজন বলে মনে হল।'
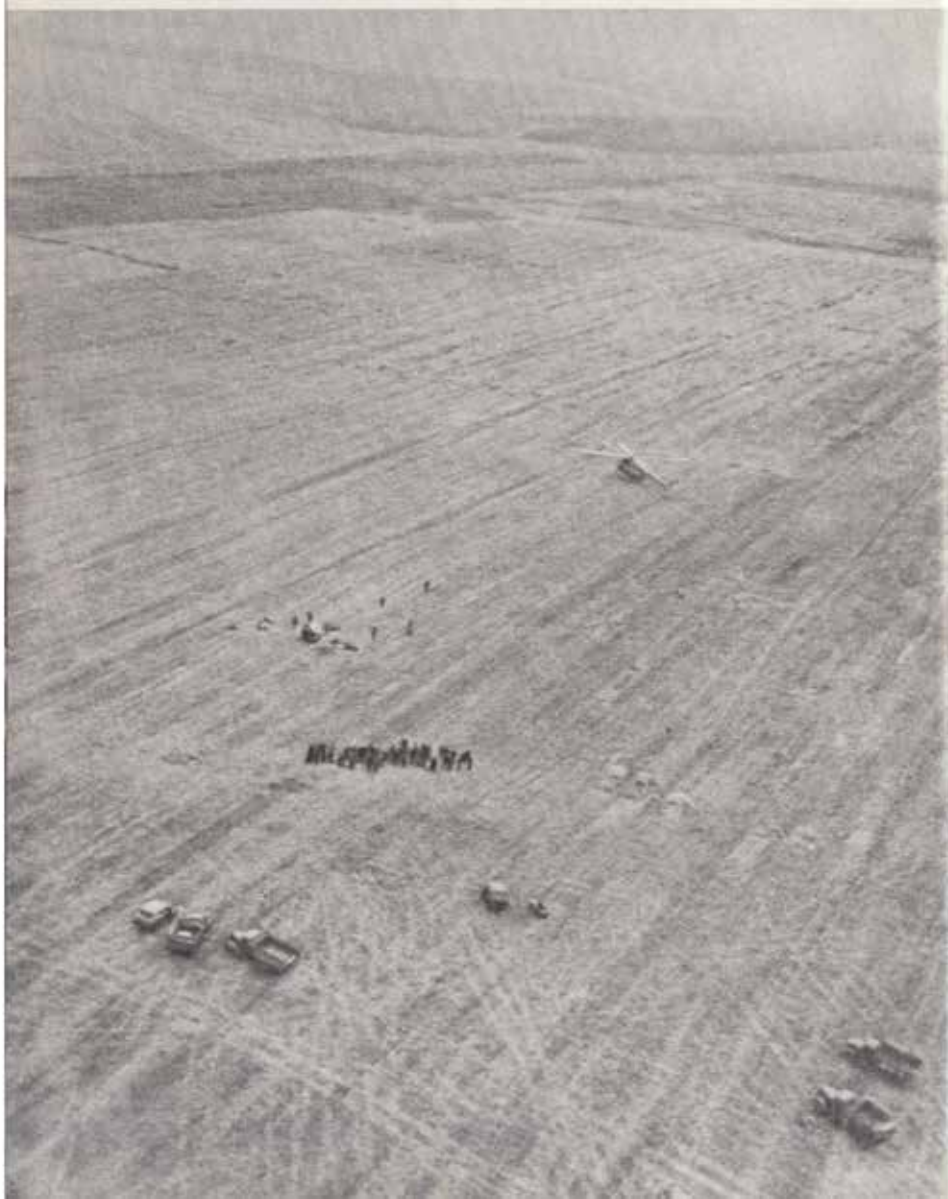
অবতরণের অব্যবহিত পরে।
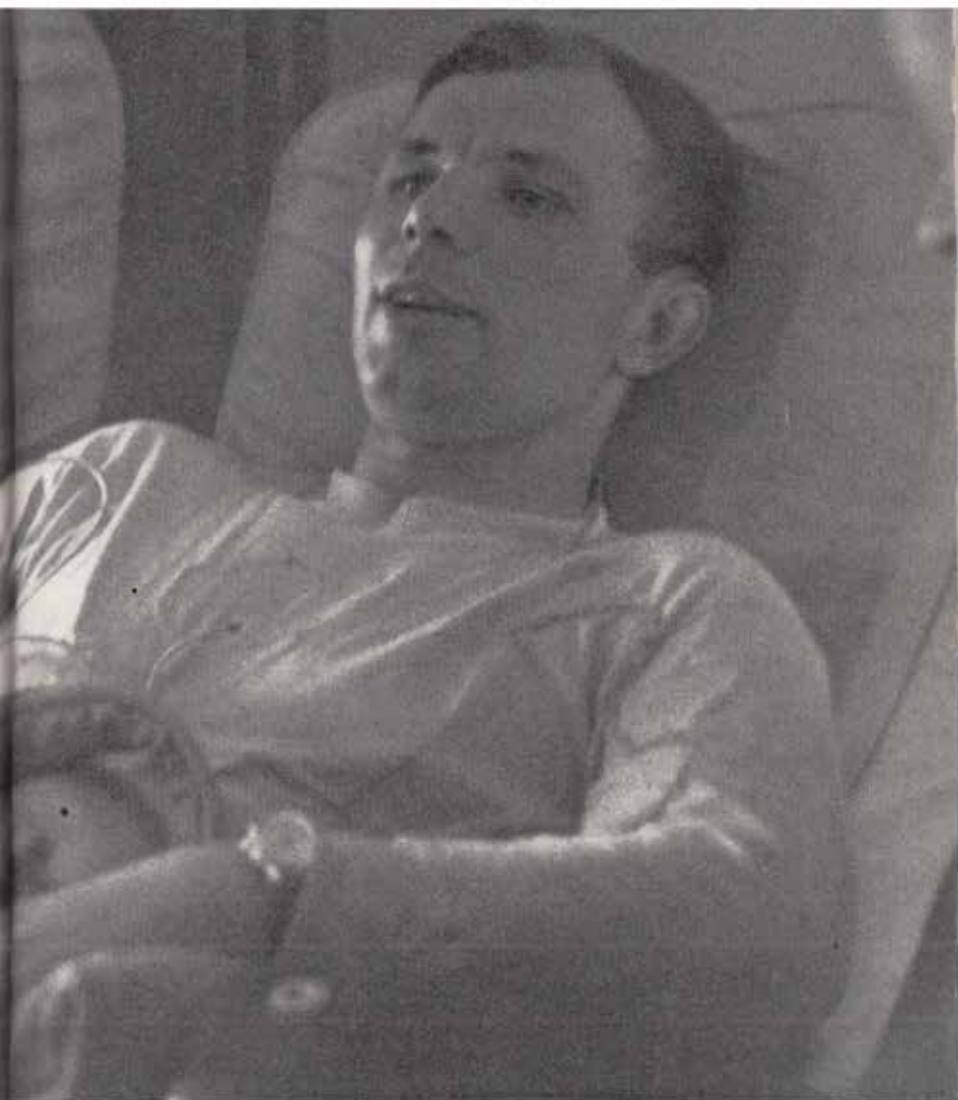
এবার মস্কোয়।

বিশ্বের প্রথম ব্যোমনাবিক লাল গালিচার পথে কদমে কদমে এগিয়ে এসে রিপোর্ট দিলেন: 'মানব ইতিহাসে এই প্রথম ১২ই এপ্রিল সোভিয়েত মহাজাগতিক জাহাজ 'ভস্তক'এর উড্ডয়ন সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে...'
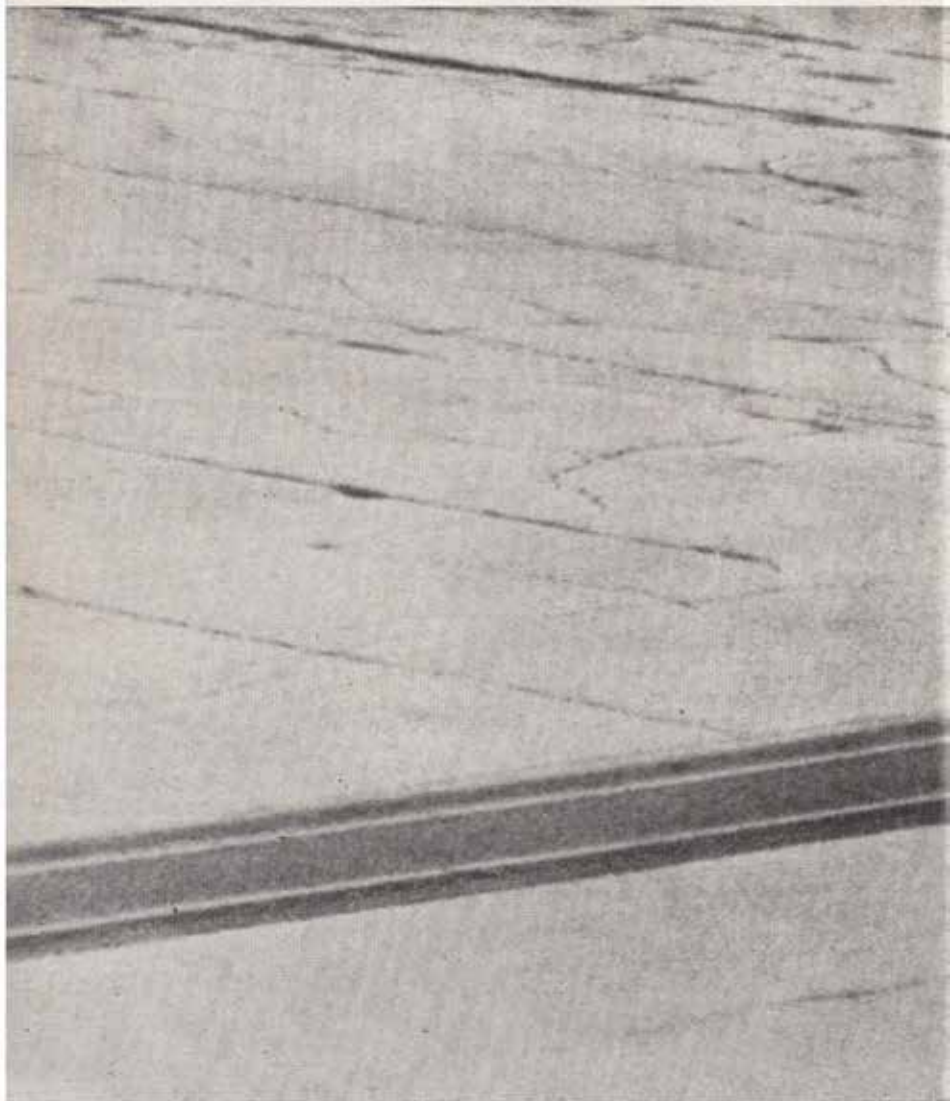
মা আন্না তিমোফেয়েভনা, বাবা আলেক্সেই ইভানোভিচ আর তাঁর ভাগ্নে গেরমান তিতোভের সঙ্গে পুনর্মিলন।

মস্কোয় মহাকাশের প্রথম বিজয়ীর বরণোৎসব।

ОСКВА –
ОСМОС –
ОСКВА. УРА!
КОС

একটি অভ্যর্থনার সময় ইউরি গাগারিন বলেছিলেন: 'মহাকাশ থেকে ফেরার পর আমাদের কোনো একজন ব্যোমনাবিকও আমাদের নীল গ্রহটায় আরো একবার দৃষ্টিপাত করার বাসনা ত্যাগ করে নি...'

প্রথমে তিনি গোটা গ্রহটা প্রদক্ষিণ করেন মহাকাশে থেকে, তারপর ফের তাঁর পৃথিবী পরিক্রমা শুরু হয় বরেণ্য অতিথি হিশেবে।

আর সর্বত্রই ইউরি গাগারিন ছিলেন শান্তি ও মৈত্রীর দূত।

সাঁতাকারের যাঁরা দুঃসাহসী, পরিবারের প্রতি, শিশুদের প্রতি স্নেহ মমতায় তাঁদের সবারই বুক ভরা।

'খবরের কাগজগুলো যেমন আমায় আনন্দ দিয়েছে, তেমনি বিরক্তও করেছে,' একবার স্বীকার করেছিলেন গাগারিন, 'শুধু স্বদেশের নয়, সারা বিশ্বের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে ওঠা খুবই বিষম একটা বোঝা। আমার ইচ্ছে হয়েছিল তক্ষুণি বসে লিখে দিই যে ব্যাপারটা মোটেই একজনাকে নিয়ে নয়, হাজার হাজার বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ আর শ্রমিক এ যাত্রার আয়োজন করেছিলেন আর আমার ব্যোমনাবিক সাথীদের যে কোনো ব্যক্তিই উড্ডয়নটা সফল করতে পারতেন...'

চোখ বুজলেই ইউরির মুখখানা ভেসে ওঠে। ভারি চঞ্চল সেটা, হৃদয়াবেগের ক্ষীণতম ছায়াপাতও ফুটে ওঠে তাতে, তারপর চট করেই বদলে যায়, জ্বলজ্বলে মেজাজের কোনো লোকের বেলায় যা হয়...

ইউরি ছিল আবেগপ্রবণ। কাজ নিয়ে তার আবেগ। আমাদের কাজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন সবকিছুতেই সে প্রবল সাড়া দিত। আমাদের প্রতিটি সাফল্যেই খুশি হয়ে উঠত সে, কোনো বিঘ্ন ঘটলে ভয়ানক কষ্ট পেত।

না, দুর্বৃহতায় ভয় ছিল না তার। কাজ নিয়ে সে মেতে থাকত। ভয়ানক! নিজের আবেগ, বিবেকনিষ্ঠা ও অসাধারণ দায়িত্ববোধে সে সংক্রামিত করে তুলত আমাদের। ওর কাছে আমরা শিখতাম।

কত কথাই না বলা যায় ওকে নিয়ে। খোলা মনের লোক ইউরি, চালাকি নেই, প্যাঁচ নেই। একেবারে স্বচ্ছ...

শুধু একটা কথা আমি বোঝাতে পারব না। ভেবে পাই না কিভাবে সে এতগুলো দায়িত্ব পালন করে যেতে পারত... সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রতিনিধি ছিল সে, কমসোমল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সোভিয়েত-কিউবা মৈত্রী সমিতির সভাপতি, অসংখ্য কমিশনের প্রতিনিধি। এর মধ্যেই সময় করে সে দেখা করত লেখক ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে, হাজির হত পাইওনিয়র ও সৈনাদের মধ্যে, দেশের ভেতর অনেক ঘুরেছে সে, প্রায়ই গেছে বিদেশে...

কিন্তু এসবই তার কাজের একাংশ মাত্র। ওড়ার জন্যে তালিম, অন্যদের ট্রেনিঙ, ডিজাইন ব্যুরোয় বৈঠক, কারখানায় সফর, নিজের বিদ্যাচর্চা — কত দিকেই সে যে জড়িয়ে ছিল তা কি আর গুণে শেষ করা যায়!

আর নিজের বাড়ি? সংসার?.. না, জীবনের চৌত্রিশটি বসন্ত সে কাটিয়েছে খামোকা নয়। এ মানুষের অন্তরের সমস্ত সম্পদ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা ভাষায় সম্ভব নয়।

আলেক্সেই লেওনভ
পাইলট-ব্যোমনাবিক
সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union